রুবাইয়াৎ-ই ওমর খৈয়াম



কাজী নজরুল ইসলাম

রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম

রুবাইয়াৎ-ই ওমর খৈয়াম

অনুবাদ

কাজী নজরুল ইসলাম

ভূমিকা

সৈয়দ মুজতবা আলী

চিত্রায়ণ

খালেদ চৌধুরী

মোহন লাইব্রেরী ॥ কলিকাতা-৯

তৃতীয় মুদ্রণ—
আগষ্ট ১৯৬৫

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীজীবনকুমার বসু
৪০, বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা—৯

ব্লক তৈরী করেছেন—
শ্রীহীরালাল সেনগুপ্ত
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৯

ছেপেছেন—
শ্রীননীমোহন সাহা
রূপশ্রী প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৯, এ্যাণ্টনী বাগান লেন
কলিকাতা—৯

বেঁধেছেন—
বুক বাইণ্ডিং সেণ্টার
৪০, বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা—৯

একমাত্র পরিবেশক—
মোহন লাইব্রেরী
৩৫-এ, সূর্য্য সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৯

॥ মূল্য বারো টাকা মাত্র ॥

নজরুল ইসলাম ও ওমর খৈয়াম

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, রাজমহল, শ্রীরামপুর, হুগলী এবং পরবর্তী যুগে কলকাতায় অনেকখানি আরবী-ফার্সীর চর্চা হয়েছিল বটে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এ চর্চা খুব ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। তার প্রধান কারণ অতি সরল—ইসলাম পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে পূব-বাংলার মত ছড়িয়ে পড়তে পারেনি, কাজেই অতি সহজেই অনুমান করা যায়, চুরুলিয়া অঞ্চলে পীর-দরবেশদের কিঞ্চিৎ সমাগম হয়ে থাকলেও মৌলবী-মৌলানারা সেখানে আরবী-ফার্সীর বড় কেন্দ্র স্থাপনা করতে পারেননি।

তদুপরি নজরুল ইসলাম ইস্কুলে সুবোধ বালকের মত যে খুব বেশী আরবী-ফার্সী চর্চা করেছিলেন তাও মনে হয় না। ইস্কুলে তিনি আদৌ ফার্সী (আরবীর সম্ভাবনা নগণ্য) অধ্যয়ন করেছিলেন কি-না, সে সম্বন্ধেও আমরা বিশেষ কিছু জানিনে। শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ নিশ্চয়ই অনেক কিছু বলতে পারবেন।

তারো পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেওয়ার ফলে তিনি যে এ সব ভাষায় খুব বেশী এগিয়ে গিয়েছিলেন তাও তো মনে হয় না। পল্টনের হাবিলদার যে জোব্বা-জাব্বা পরে দেওয়ানা-দেওয়ানা ভাব ধরে হাফিজ-সাদীর কাব্য কিম্বা মৌলানা রুমীর মসনবী সামনে নিয়ে কুঞ্জে কুঞ্জে ছন্নছাড়ার মত ঘুরে বেড়াবে তাও তো মনে হয় না। এমন কি রঙীন সর্দারিয়ার উপর মলমলের বুটিদার অঙ্গারখা পরে হাতে শিরাজীর পাত্র নিয়ে সাকীর কণ্ঠে ফার্সী গজল আর কসীদা-গীত শুনছেন, এও খুব সম্ভবপর বলে মনে হয় না। কসম খেয়ে এ বিষয়ে কোনো কিছু বলা শক্ত তবে এটা তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, কাব্যে যদ্যপি 'খাকী' এবং 'সাকী' চমৎকার মিল, তবু বাস্তব জীবনে এদুটোর মিল এবং মিলন সচরাচর হয় না।

তবু নজরুল ইসলাম মুসলিম ভদ্রঘরের সন্তান। ছেলেবেলায় নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ আলিফ, বে, তে করেছেন, দোয়া-দরুদ (মন্ত্র-তন্ত্র) মুখস্ত করেছেন, কুরান পড়াটা রপ্ত করেছেন। পরবর্তী যুগে তিনি কুরানের শেষ অনুচ্ছেদ 'আমপারা' বাঙলা ছন্দে অনুবাদ করেন—হালে সেটি প্রকাশিত হয়েছে। সে পুস্তিকাতে তাঁর গভীর আরবী জ্ঞান ধরা পড়ে না—ধরা পড়ে তাঁর কবি-জনোচিত অন্তদৃষ্টি এবং আমপারার সঙ্গে তাঁর যে আবাল্য পরিচয়। বিশেষ করে ধরা পড়ে, দরদ দিয়ে সৃষ্টিকর্তার বাণী (আল্লার 'কালাম') হৃদয়ঙ্গম করার তীক্ষ্ন এবং সূক্ষ্ম প্রচেষ্টা।

এরই উপর আমি বিশেষ করে জোর দিতে চাই। ফার্সী তিনি বহু মোল্লা-মৌলবীর চেয়ে কম জানতেন, কিন্তু ফার্সী কাব্যের রসাস্বাদন তিনি করেছেন তাঁদের চেয়ে অনেক বেশী। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই অনেক সংস্কৃত ব্যাকরণবাগীশদের চেয়ে কম সংস্কৃত জানতেন, কিন্তু তিনি লিরিকের রাজা মেঘদূতখানা জীবন এবং কাব্য দিয়ে যতখানি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন ততখানি কি কোনো পণ্ডিত পেরেছেন? বহু লোকই বাঙলা দেশের মাটি নিখুঁতভাবে জরিপ করেছে, কিন্তু ঐ মাটির জন্য প্রাণ তো তারা দেয়নি। প্রাণ দেনেওলা ক্ষুদিরাম, কানাইলাল ভালো জরিপ জানতেন একথাও তো কখনো শুনিনি।

কাজী রোমাণ্টিক কবি। বাঙলা দেশের জল-বাতাস, বাঁশ-ঘাস যে রকম তাঁকে বাস্তব থেকে স্বপ্নলোকে নিয়ে যেত, ঠিক তেমনি ইরান-তুরানের স্বপ্ন-ভূমিকে তিনি বাস্তবে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন বাঙলা কাব্যে। ইরানে তিনি কখনো যাননি, সুযোগ পেলেই যে যেতেন, সে কথাও নিঃসংশয়ে বলা যায় না (শুনেছি, পণ্ডিত হয়েও মাক্সমুলার ভারতবর্ষকে ভালবাসতেন এবং তাই বহুবার সুযোগ পেয়েও এদেশে আসতে রাজী হননি।) কিন্তু ইরানের গুল্-বুল্‌বুল্ শীরাজী-সাকী তাঁর চতুর্দিকে এমনই এক জানা-অজানার ভুবন সৃষ্টি করে রেখেছিল যে গাইড-বুক, টাইম-টেবিল, ছাড়াও তিনি তার সর্বত্র অনায়াসে বিচরণ করতে পারতেন। গুণীরা বলেন, প্রত্যেক মানুষেরই দুটি করে মাতৃভূমি—একটি তাঁর আপন জন্মভূমি ও দ্বিতীয়টি ফ্রান্স। কাজীর বেলা বাঙলা ও ইরান। কীটস বায়রনের বেলা যে রকম ইংল্যাণ্ড ও গ্রীস।

আরব ভূমির সঙ্গে কাজী সায়েবের যেটুকু পরিচয় সেটুকু প্রধানতঃ ইরানের মারফতেই। কুরান শরীফের 'হারানো ইউসুফের' যে করুণ কাহিনী বহু মুসলিম অমুসলিমের চোখের জল টেনে এনেছে তিনি কবিরূপে তার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন ফার্সী কাব্যের মারফতে।

দুঃখ করো না হারানো য়ুসুফ
কানানে আবার আসিবে ফিরে।
দলিত শুষ্ক এ-মরু পুনঃ
হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে ॥
ইউসুফে গুম্‌গশ্‌তে বা'জ্‌ আয়দ্‌ ব্‌কিনান্‌
গম্‌ ম্‌-খুর।
কুল্‌বয়ে ইহ্‌জান্‌ শওদ্‌ রুজি গুলিস্তান্‌
গম্‌ ম্‌-খুর॥

কাজী সায়েবের প্রথম যৌবনের এই ফার্সী কবিতাটির বাঙলা অনুবাদ অনেকেরই মনে থাকতে পারে। 'মেবার পাহাড়, মেবার পাহাড়ে'র অনুকরণে 'শাতিল আরব শাতিল আরব' ঐ যুগেরই অনুবাদ।

কোনো কোনো মুসলমান তখন মনে মনে উল্লসিত হয়েছেন এই ভেবে যে. কাজী 'বিদ্রোহী' লিখুন আর যা-ই করুন, ভিতরে ভিতরে তিনি খাঁটি মুসলমান। কোনো কোনো হিন্দুর মনেও ভয় হয়েছিল (যাঁরা তাঁকে অন্তরঙ্গ-ভাবে চিনতেন তাঁদের কথা হচ্ছে না) যে, কাজীর হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতি বোধ হয় বাঙলার জন্য নয়—তাঁর দরদ বুঝি ইরান-তুরানের জন্য। পরবর্তী যুগে—পরবর্তী যুগে কেন, ঐ সময়েই কবিকে যাঁরা ভালো ক'রে চিনতেন, তাঁরাই জানতেন. ইরানী সাকীর গলায় কবি যে বার বার শিউলির মালা পরিয়ে দিচ্ছেন তার কারণ সে তরুণী মুসলমানী ব'লে নয়, সে সুন্দরী ইরানের বিদ্রোহী কবিদের নর্ম সহচরী ব'লে—ইরানের বিদ্রোহী আত্মা কাব্যরূপে, মধুররূপে তার চরম প্রকাশ পেয়েছে সাকীর কল্পনায়।

সে বিদ্রোহ কিসের বিরুদ্ধে?

এ স্থলে কিঞ্চিৎ ইতিহাস আলোচনার প্রয়োজন।

ইরানী ও ভারতীয় একই আর্যগোষ্ঠীর দুই শাখা। দুই জাতির ইতিহাসেই অনেকখানি মিল দেখতে প্রাওয়া যায়, কিন্তু ইরানীরা যে রকম দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে একদিকে মিশর প্যালেষ্টাইন, অন্য দিকে গ্রীস পর্যন্ত হানা দিয়েছিল. ভারতীয়েরা সে রকম করেনি। দ্বিতীয়তঃ বিদেশী অভিযানের ফলে ইরানভূমি যে রকম একাধিকবার সম্পূর্ণ লণ্ডভণ্ড হয়েছে, ভারতবর্ষের ভাগ্যে তা কখনো ঘটেনি। এ সব কারণেই হোক বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক, ইরানীরা সভ্যতার প্রথম যুগ থেকেই এক উগ্র স্বাজাত্যাভিমানের সৃষ্টি করে। ভারতবর্ষ যেখানে শান্তভাবে বিদেশীর ভালো-মন্দ দেখে-চিনে নিজকে মেলাবার, পরকে আপন করার চেষ্টা করেছে, ইরান সেখানে আদৌ সে চেষ্টা

করেনি এবং শেষটায় যখন বাধ্য হয়ে সব কিছু নিতে হয়েছে তখন করেছে পরবর্তীকালে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

গ্রীস-রোমের কাছে পরাজিত হওয়া এক কথা, আর প্রতিবেশী 'অনুন্নত', 'অর্ধসভ্য' আরবদের কাছে পরাজিত হওয়া আরেক কথা। তদুপরি গ্রীক রোমানরা ইরানে যে সভ্যতা এনেছিল, তাতে গরীব-দুঃখীর জন্য নূতন কোনো আশার বাণী ছিল না। যে নবীন ধন-বণ্টন পদ্ধতি দ্বারা হজরৎ মুহম্মদ আরব দেশের আপামর জনসাধারণকে ঐক্যসূত্রে গ্রন্থন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁর বাণী এসে পৌঁছল ইরানে। ফলে মুহম্মদ সাহেবের পরবর্তিগণ যখন একদিন অন্যান্য জাতির মত দিগ্বিজয়ে বেরোল তখন ইরানী শোষক সম্প্রদায় দেখে মর্মাহত ও স্তম্ভিত হ'ল যে, ইরানের জনসাধারণ আরবের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হ'ল না। তারপর আরবরা বিজিত দেশের ধর্মজগতে যে সাম্যবাদ ও অর্থের ক্ষেত্রে যে ধনবণ্টন পদ্ধতি প্রচার করলো, তাতে আকৃষ্ট হয়ে ইরানের জনসাধারণ মুসলমান হয়ে গেল। জ্ঞানাভিমানী ও ধর্মযাজক সম্প্রদায়ও শেষ পর্যন্ত ঐ ধর্ম গ্রহণ করল। তখনকার মত ইরানী সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রায় লোপ পেয়ে গেল।

কিন্তু বিদ্রোহ লুপ্ত হ'ল না।

সেটা দেখা দিল প্রায় চারশ' বছর পরে ফিরদৌসীর মহাকাব্য 'শাহনামাতে।' রাষ্ট্রভাষা আরবীকে উপেক্ষা ক'রে ফিরদৌসী গাইলেন প্রাক মুসলিম যুগের ইরানী বীরের কাহিনী, রাজার দিগ্বিজয়, প্রেমিকের বিরহ-মিলন গাথা—নবীন অথচ সনাতন সেই ফার্সী ভাষায়। যে ফার্সী কাব্য-সাহিত্য পরবর্তী যুগে বিশ্বজনের বিস্ময় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়, তার প্রথম সার্থক কবি ফিরদৌসী।

এই নূতন ভাষাতে, নবীন প্রাণে উন্মত্ত হয়ে যে সব কবি কাব্যের সর্ব বিষয়বস্তু নিয়ে নব নব কাব্যধারার প্রবর্তন করলেন তার কাছে পরবর্তী যুগের ইউরোপীয় রেনেসাঁসও এতখানি সর্বমুখী ব'লে মনে হয় না। দু'শ বছর যেতে না যেতেই বিশ্বের কাব্যজগতে ইরান তার অদ্বিতীয় আসন সৃষ্টি ক'রে নিল।

এঁদের মধ্যে সত্য বিদ্রোহী কবি ওমর খৈয়াম।

* * * *

ইরানে ইসলাম প্রচারিত হওয়ার ফলে শিক্ষিত তথা পুরোহিত সম্প্রদায়ের ভিতর বিভিন্ন আন্দোলনের সৃষ্টি হ'ল। তার প্রথম

(১) যাঁরা মুসলিম শাস্ত্রের চর্চা ক'রে যশস্বী হলেন। ভাবলে আশ্চর্য বোধ হয়, ইরানীরা আরবীর মত কঠিন ভাষা আয়ত্ত ক'রে সে শাস্ত্রে এতখানি

ব্যুৎপত্তি অর্জন করলো কি ক'রে? মুসলমানদের মনুর নাম ইমাম আবু হানীফা। পৃথিবীর শতকরা আশী জনেরও বেশী মুসলমান আজ নিজকে হানফী অর্থাৎ আবু হানীফার মতবাদে বিশ্বাসকারী ব'লে পরিচয় দেয়। কিন্তু তাতে আশ্চর্য হবার মত কীই বা আছে? শ্রীশ্রীশংকরাচার্য তো শুনেছি ভারতবর্ষের দক্ষিণতম কোণের লোক, এবং তাঁর ধমনীতে যে অত্যধিক আর্যরক্ত ছিল তাও তো মনে হয় না, অন্ততঃ একথা তো অনায়াসে বলা যেতে পারে যে, আর্য উত্তর ভারতের তুলনায় মালাবারে সংস্কৃত চর্চা ছিল অনেক কম। তবু যে তিনি শুধু তাঁর মাতৃভূমি মালাবারে বৌদ্ধদের পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাই নয়, আর্য উত্তর ভারতেও তিনি তাঁর বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইরানী আবু হানীফার মতবাদও একদা ইসলামের জন্মভূমি মক্কা-মদীনা তথা আরব দেশ জয় করতে সক্ষম হয়েছিল। এ রকম উদাহরণ পৃথিবীতে আরো আছে।

(২) যাঁরা ক্রিয়াকাণ্ড, টীকা-টিপ্পনী, মন্ত্রতন্ত্রে সম্পূর্ণ আস্থা না দিতে পেরে 'রহস্যবাদ' বা সুফীতত্ত্বের প্রচার এবং প্রসার করতে লাগলেন। এঁরা ভগবানের আরাধনা করেন রসের মাধ্যমে এবং বাঙলার বৈষ্ণব তথা 'মরমিয়াদের' সঙ্গে এঁদের তুলনা করা যেতে পারে।

মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা
কাজ নাই, সখি, তাঁদের কথায়
বাহিরে থাকেন তাঁরা।

* * * *

ঐ চাহনিতে বিশ্ব মজেছে
পড়িয়াছে কত অশ্রুধার
পাগল করিল এ প্রমত্ত আঁখি
কুলমান রাখা হৈল ভার।

এ ধরণের কবিতা সুফী ও বৈষ্ণবদের ভিতর এতই প্রচলিত যে, কোন্‌টি সুফী কোন্‌টা বৈষ্ণব ধরে ওঠা অসম্ভব। যদি বলি,

প্রেম নাই, প্রিয় লাভ আশা করি মনে
রাধিকার মত ভ্রান্ত কে ভব-ভবনে?

তবে চট ক'রে কেউ আপত্তি করবেন না। অথচ আসলে আছে,

প্রেম নাই, প্রিয় লাভ আশা করি মনে
হাফেজের মত ভ্রান্ত কে ভব-ভবনে?

('সদ্ভাব-শতক' কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের অনুবাদ)

বৈষ্ণবদের সঙ্গে এ'দের আরো বহু মিল আছে। এ'দের সূফীবাদ পরবর্তী যুগে তথাকথিত 'তুর্কী'রা গ্রহণ করে। বাঙলা দেশে প্রথম যে মুসলমানরা আসেন তাঁদের আমরা 'তুর্ক' 'তুরুক্', নাম দি (প্রাচীন বাঙলার 'মুসলমান' শব্দের প্রতিশব্দ 'তুর্ক'—তামিলে এখনো 'তুরস্কম') এবং তাঁদের চক্রাকারে নৃত্য করে আল্লার নাম জপ ('জিক্‌র'—যার থেকে বাঙলা 'জিগির' শব্দ এসেছে) করা দেখে 'তুর্কী-নাচন-নাচা' প্রবাদটি এসেছে। বৈষ্ণবদের মত এ'রাও জপ করতে করতে 'হাল' ('দশা') প্রাপ্ত হন,—অর্থাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন ও মুখ দিয়ে তখন প্রচুর ফেনা বেরয়। পূর্ব ইয়োরোপে এই নাচ দেখেই ইয়োরোপীয়রা এদের নাম দিয়েছিল "ডানসিং দরবেশ"। ইংরিজীতে কথাটা এখনো চালু আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে অত্যধিক বাগাড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন, কারণ আউল-বাউল, ভাটিয়ালি-মুর্শীদীয়া গীত যাঁরাই শুনেছেন, তাঁরাই এই ফার্সী সূফী, ভক্তিবাদের কিঞ্চিৎ গন্ধস্পর্শ পেয়েছেন।

(৩) দার্শনিক সম্প্রদায়। আর্যগোষ্ঠীর দুই সম্প্রদায়—ভারতীয় ও গ্রীকরাই প্রধানতঃ দর্শনের চর্চা করেছেন।

মাহমুদ বাদশার সভাপণ্ডিত 'ভারতবর্ষ' পুস্তকের (প্রাচীন তথা অর্ধার্বাচীন ভারতের বহুমুখী কার্যকলাপ, চিন্তা অনুভূতির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত হতে চান তাঁদের পক্ষে এ পুস্তক অপরিহার্য; বস্তুতঃ বর্তমান লেখক ব্যক্তিগতভাবে এ পুস্তককে 'মহাভারতের' পরেই স্থান দেয়) লেখক পণ্ডিত অল-বীরূনী মুক্তকণ্ঠে বলেছেন, 'দর্শনের চর্চা করেছেন গ্রীক এবং ভারতীয়েরা—আমরা (অর্থাৎ আরবী লেখকেরা) যেটুকু দর্শন শিখেছি তা এ'দের কাছ থেকেই।' কথাটা মোটামুটি সত্য, যদিও পণ্ডিতজনসুলভ কিঞ্চিৎ বিনয় প্রকাশ এতে রয়েছে, কারণ আরবরা গ্রীকদর্শনের আরবী অনুবাদ দিয়ে দর্শন চর্চা আরম্ভ করেছিলেন সত্য কিন্তু পরবর্তী যুগে আভিচেন্না (বু আলী সিনা), আভেরস (ইবন-ই-রুশ্‌দ্) ও অল-গাজেল্ (গজ্‌জালী—এ'র 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি' প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বাঙলায় অনূদিত হয়ে রাজশাহীতে প্রকাশিত হয়) বহু মৌলিক চিন্তা দ্বারা পৃথিবীর দর্শন ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু স্মরণ রাখা ভালো, এ'দের দর্শন শঙ্কর দর্শনেরই ন্যায় ধর্মাশ্রিত এবং যে স্থলে কুরানের বাণীর সঙ্গে গ্রীক দর্শনের দ্বন্দ্ব বেঁধেছে সেখানে তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন সে-দ্বন্দ্বের সমাধান করার এবং সময়ে সময়ে তখন তাঁরা নিও-প্লাতোনিজম অর্থাৎ ভারতের উপনিষদ সম্মত অন্তর্দৃষ্টির উপর নির্ভর করেছেন। এ'দের বিশেষ নাম 'মুতকাল্লিমূন' এবং পরবর্তী যুগে এদেশের রাজা রামমোহন তাঁর বিশ্বদর্শন (ভেল্টানশাউউঙ) নির্মাণে এ'দের পরিপূর্ণ সাহায্য নিয়েছেন।

(৪) ঐতিহাসিক ও কবিগোষ্ঠী। ইতিহাস চর্চায় আরবদের দক্ষতা সর্বজনমান্য, তবে ইরানীরাও এ-শাস্ত্র তাঁদের কাছ থেকে শিখে নিয়ে এর অনেক উন্নতি সাধন করেন। কিন্তু আমরা যে যুগের আলোচনা করছি তখনো ইরানীদের কাছে ইতিহাস ও পুরাণের পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে ধরা দেয়নি। ফিরদৌসীর 'শাহনামা' (রাজবংশ) কাব্যের রাজা-মহারাজা, নায়ক-নায়িকারা অধিকাংশই কবিজনসুলভ কল্পনাপ্রসূত—অন্তত তাঁদের কীর্তিকলাপ তো বটেই। কিন্তু সবচেয়ে লক্ষ্য করার বিষয়, প্রাক-ইসলামী এই সব অগ্নি-উপাসক নায়ক-নায়িকাদের নিয়ে ফিরদৌসীর কী গগনচুম্বী গরিমা, দম্ভ এবং সময় সময় আস্ফালন! এ যেন বিজয়ী আরবদের বার বার শুনিয়ে শুনিয়ে বলা, 'কালনেমির বিরূপাবর্তনে আজ আমাদের পতন ঘটেছে বটে, কিন্তু এই কাব্যে দেখ, আমরা একদিন সভ্যতার কত উচ্চ শিখরে উঠেছিলুম। সে-দিকে একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখো। ওখানে তোমরা কখনো পৌঁছওনি, পৌঁছবেও না।' এ সুর কেমন যেন আমাদের চেনাচেনা মনে হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই ইংরেজকে শুনিয়ে শুনিয়ে বার বার এই গান গেয়েছে। ('অন্য জাতি দিগ্বসন পরিত যখন। ভারতে ঋগ্বেদ পাঠ হইত তখন।' কিন্তু, আফসোস! শাহনামার মত মহা-কাব্যের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারেনি। হেমচন্দ্র ও ইকবালকে ফিরদৌসীর আসনে বসানো কঠিন এবং অন্যান্য কবিরা যে 'নির্লজ্জতা' দেখালেন ('নির্লজ্জতা শব্দটি ভেবে চিন্তেই কুটেশনের ভিতর ফেললুম, কারণ কাব্যে রসস্বরূপে প্রকাশ পেলে চরম নির্লজ্জতাও পাঠকের মনে বিদ্রোহ সঞ্চার করতে পারে না। আমাদের দুই মাইডিয়ার হীরো পবননন্দন ভীমসেন ও হনুমান যে সব দম্ভ এবং আস্ফালন করেছেন তা স্বকর্ণে শুনতে হলে 'রাম রাম' বলতে হ'ত, কিন্তু কাব্যে পাঠ করে আনন্দাশ্রু বিগলিত হয়, মনে হয়, ঐ সময়ে, ঐ অবস্থায় এ বাক্য ছাড়া অন্য কিছুই এঁদের মুখে মানাতো না, বলতে ইচ্ছে করে, ধন্য ধন্য যুগ্ম-কবি যাঁরা দম্ভকে বিনয়, লজ্জাকে শ্লাঘায় পরিণত করতে পারেন!') সেটা ঢাকবার প্রয়াস আজও ইরানে-তুরানে সহজেই চোখে পড়ে। সকলেই জানেন, মুসলমানধর্মে মদ খাওয়া মানা আর সেই মদও যদি খাওয়া হয় তন্বঙ্গী তরুণী সাকীর সঙ্গে—যার সঙ্গে 'বে-থা' হয়েছে কিনা সে সম্বন্ধেও কবিরা বড় মারাত্মক স্মৃতিশক্তিহীন—তাও আবার ঝরণা তলায়, নির্জনে, সাঁঝের ঝোঁকে, যখন কিনা 'মগরিবের আইন ওক্'তে নামাজ পড়ার কথা, আল্লা-রসুলের নাম স্মরণ করার আদেশ—এবং মনে মনে আওড়ানো,

"মত্ত, মাতাল ব্যসনী আমি গো, আমি কটাক্ষ বীর"

তা হলে অবস্থাটা কি রকমের হয়? ৩

কথা সত্য, মোল্লারা সুবো-শাম ভালো ভালো কেতাবপুঁথি পড়েন, কিন্তু মাঝে-মধ্যে, নিতান্ত কালে-কস্মিনে দু' একখানা কাব্যগ্রন্থের পাতাও তো তাঁরা ওলটান। কবি হাফিজ অবশ্য বিস্তর ঢলাঢলির পর ওকীবহাল হয়ে অভয়বাণী বলেছিলেন,

"মোল্লার কাছে কোরো না কিন্তু মোর পিছে অনুযোগ,
তারো আছে, জেনো, আমারি মতন, সুরামত্ততা রোগ।"

তবু, এ কথাও তো অজানা নয় যে, মোল্লারাই নীতিবাগীশ সাজে আর পাঁচজনের তুলনায় বেশী।

এবং কার্যতঃ দেখা গেল তারা এবং তাদের চেলাচামুণ্ডার দল ঝোপে-ঝাপে বসে আছে, শরাব-কবাব জান্-কী-সাকী সুদ্ধ কবিদের বমাল গ্রেফতার করার জন্য।

কবিরা এবং বিশেষ ক'রে আমাদের মত তাঁদের গুণগ্রাহীরা, উচ্চকণ্ঠে তখন বললেন, এ-সব কবিতা রূপকে নিতে হয়। মদ্য অর্থ ভগবদ প্রেম, সাকী অর্থ যিনি সে প্রেম আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেন, অর্থাৎ পীর, গুরু, মুরশীদ, পয়গম্বর। এবং এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, হাফিজ, আত্তার, এমন কি ওমর খৈয়ামের বহু কবিতার কোনো অর্থই করা যায় না, যদি সেগুলো রূপক দিয়ে অর্থ না করা হয়। কিন্তু বাদবাকীগুলো?

আমাদের পদাবলীতেও তাই। এবং এমন সব পদ আছে যাতে মর্ত্য আর অমর্ত্য প্রেম এমনভাবে মিশে গিয়েছে যে, দুটোকে আদৌ আলাদা করা যায় না—সমস্ত হৃদয়-মন এক অদ্ভুত অনির্বচনীয় নবরসে আপ্লুত হয়ে যায়।

তোমার চরণে আমার পরাণে
লাগিল প্রেমের ফাঁসী
সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী।

মর্ত্য প্রেমই যদি হবে তবে তো 'পরাণে' 'পরাণে' প্রেমের ফাঁসী লাগবে। 'পরাণে' আর চরণে প্রেমের বাঁধ বেঁধে দিয়ে কী এক অপূর্ব অতুলনীয় ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়েছে—যার অনুভূতি এ-জগতে আরম্ভ আর পরিপূর্ণতা লাভ করবে সেই অমর্তালোকে, 'ব্যর্থ নাহি হোক এ-কামনা।'

কিন্তু মাঝে মাঝে মনে দ্বিধা জাগে, সর্বত্রই কি রূপকের শরণাপন্ন হ'তে হবে? যথা—

অদ্যাপ্যা-শোক-নব-পল্লব-রক্ত হস্তাং
মুক্তাফল প্রচয়চুম্বিত-চুচুকাগ্রাম্।
অন্তঃস্মিতেন্দুসিত পাণ্ডুর গণ্ডদেশাং,
তাং বল্লভাং রহসি সংবলিতাং স্মরামি॥

বিদ্যাপক্ষে

অশোক-পল্লব নব সম পাণিতলে।
কুচাগ্র শোভিত হয়েছে মুক্তাফলে॥
অন্তরে ঈষৎ হাস গণ্ডে বিকসিত।
শরতের চন্দ্র যেন ত্রিলোক-মোহিত॥
নির্জনেতে বসি করি সদা সম্ভাবনা।
প্রাণাধিকা প্রেয়সীকে নিতান্ত কামনা॥
তথাপি বিদ্যার নাহি পাই দরশন।
বিদ্যা তন্ত্র মন্ত্র করি ত্যজিব জীবন॥

দ্বিতীয়ার্থ কালীপক্ষে।

রুধির-খর্পর হস্তে দিবানিশি যার।
রক্তবর্ণ করতল হয়েছে শ্যামার॥
উচ্চ পয়োধরপরি বান্ধিত কাঁচলী।
হীরক জড়িত হারে শোভে মুক্তাবলী॥
অন্তরে গভীর হাস্য ঈষদ্ধাস্য কালে।
কিরণে আছয়ে গণ্ড পাণ্ডুবর্ণা ভালে॥
অন্তর জগতে দেখি আলোক বিরাজে।
কি শোভা প্রকাশে কুলকুণ্ডলিনী মাঝে॥
স্ববল্লভ সংবলিতা বিশ্বের কারিণী।
নিদানে গর্জনে স্মরি তারে গো তারিণী॥

(চৌরপঞ্চাশৎ, ভারতচন্দ্র, বসুমতী সংস্করণ, পৃঃ ৮)

পূর্বোল্লিখিত এই সব তাবৎ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ওমরের বিদ্রোহ।

* * * *

গিয়াসউদ্দীন আবুল্ ফৎহ্ ওমর ইবন্ ইব্রাহীম অল-খৈয়াম ইরান-দেশের নিশাপুর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মদিন কিম্বা সন ঠিকমত জানা যায় নি, এমন কি তাঁর মৃত্যুর সনও মোটামুটি ১১২৩ খৃষ্টাব্দ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।

খৈয়াম শব্দের অর্থ তাম্বু নির্মাতা। এ ওজনের শব্দ বাঙলায় আরো আছে। 'কত্তাল' থেকে বাঙলা কোতয়াল, এবং 'খম্মার' থেকে 'খোঁয়ারী' (ভাঙা) শব্দ এসেছে। রান্নার মশলা-বিক্রেতা অর্থে 'বক্কাল' শব্দও একদা বাঙলাতে

সুপ্রচলিত ছিল—আরবীতে শব্দটির অর্থ 'মুদী' বা 'মশলা বিক্রেতা'। ত্রিবর্ণের মূল ধাতুতে—যথা 'দ-খ-ল' 'দখল করা' 'ক-ত-ল' 'কোতল করা' দ্বিতীয় ব্যঞ্জন বর্ণকে দ্বিত্ব করে তাতে দীর্ঘ 'আ'-কার যোগ করলে যে কর্তাবাচক শব্দ উৎপন্ন হয় তার অর্থ 'ঐ কর্ম সে পুনঃ পুনঃ করে থাকে।' তাই 'খম্মার' অর্থ 'যে ঘন ঘন মদ খায়' (বাঙলার তাই সে সকাল বেলা 'খম্মারী' বা খোঁয়ারী ভাঙে) অর্থাৎ 'পাইকারী মাতাল', 'মদ খাওয়া তার ব্যবসা'। 'কতল' করা যার ব্যবসা সে কোতয়াল ('কত্তাল'), 'জল্লাদ'ও ঐ অর্থে ব্যবহার হয়। 'খয়য়াম' অর্থ 'যে পুনঃ পুনঃ তাম্বু নির্মাণ করে'—'তাম্মু নির্মাণকারী।' বাঙলায় 'খইআম', 'খইয়াম' বা 'খৈয়াম' লিখলে মোটামুটি মূল উচ্চারণ আসে। অবশ্য 'খ'-র উচ্চারণ বাঙলা মহাপ্রাণ 'খ'-র মত নয়—আমরা বিরক্ত হলে যে রকম 'আখ'-এর 'খ' অক্ষরটি উচ্চারণ করে থাকি অর্থাৎ ঘৃষ্ট কণ্ঠ্যব্যঞ্জন। স্কচের 'লখ' ও জর্মনের 'বাখ'-এর 'খ'-এর মত। আসামীতে 'অহমিয়া'র 'হ' অনেকটা সেই রকম।

কিন্তু কবি ওমর তাঁবুর ব্যবসা করতেন না। ওটা তাঁর বংশের পদবী মাত্র। আজকের দিনের কোনো 'সরকার' যে-রকম রাইটারজ বিল্ডিঙে চীফ সেক্রেটারী (সরকার) নন কিম্বা কোনো কোনো ঘটকপদবীধারী যে রকম সমাজে কুলাচার্যের কর্ম করেন না। ওমর কিন্তু তাঁর পরিবারের এই উপাধিটি নিয়ে তিক্ত ব্যঙ্গ করতে ছাড়েন নি:—

জ্ঞান-বিজ্ঞান ন্যায় দর্শন সেলাই করিয়া মেলা
খৈয়াম কত না তাম্বু গড়িল; এখন হয়েছে বেলা
নরককুণ্ডে জ্বলিবার তরে। বিধি-বিধানের কাঁচি
কেটেছে তাম্বু—ঠোকর খায়, পথ-প্রান্তরে ঢেলা।

(লেখকের এমেচারী অক্ষম অনুবাদে রসিক পাঠক অপরাধ নেবেন না। অন্য কারো অনুবাদ না পেয়ে বাধ্য হয়ে মাঝে-মধ্যে এ-ধরণের 'অনুবাদ' ব্যবহার করতে হয়েছে।)

এস্থলে উল্লেখ প্রয়োজন রুবাঈ জাতীয় চতুষ্পদীতে প্রায়শঃ প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ ছত্রে মিল থাকে—তৃতীয় ছত্রান্ত স্বাধীন। ইরানী আলঙ্কারিকরা বলেন, তৃতীয় ছত্রে মিল না দিলে চতুর্থ ছত্রের শেষ মিলে বেশী ঝোঁক পড়ে এবং শ্লোক সমাপ্তি তার পরিপূর্ণ গাম্ভীর্য ও তীক্ষ্নতা পায়। কথাটা ঠিক, কারণ আমরাও তেতাল বাজাবার তৃতীয়ে এসে খানিকটা কারচুপি করলে সম মনকে ধাক্কা দেয় আরো জোরে। পাঠককে এই বেলাই বলে রাখি, তৃতীয় ছত্রে মিলহীন এই জাতীয় শ্লোক পড়ার অভ্যাস করে রাখা ভালো। নইলে নজরুল ইসলামের ওমর-অনুবাদ পড়ে পাঠক পরিপূর্ণ রস গ্রহণ করতে

পারবেন না। কারণ কাজী আগাগোড়া ক ক খ ক মিলে ওমরের অনুবাদ করেছেন। কান্তি ঘোষ করেছেন বাঙলা রীতিতে, অর্থাৎ ক ক খ খ)।

ভাগ্যক্রমে ওমরের জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। পাকাপাকি শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে যে তিনি গণিতশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন এবং অবসর কাটাবার জন্য দৈবেসৈবে চতুষ্পদী লিখতেন—তাঁর নামে প্রচলিত গজল, মসনবী বা অন্য কোনো শ্রেণীর দীর্ঘতর কবিতা আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। এইটুকু সংবাদ ছাড়া বাদবাকী কিংবদন্তী। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যাঁর জন্মের তারিখ কেন সন পর্যন্ত জানা নেই যাঁর পরলোক-গমনের সন পর্যন্ত পণ্ডিতদের গবেষণাধীনে তাঁর সম্বন্ধে যে প্রচুর কিংবদন্তী প্রচলিত থাকবে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

তবে তিনি যে উত্তম গুরুর কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন সে-বিষয়ে পণ্ডিত গণ একমত। স্মরণ রাখা ভালো যে, ছাপাখানার প্রচলন না হওয়া পর্যন্ত অল্প লোকই গুরুর সাহায্য বিনা উচ্চশিক্ষা লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন।

কথিত আছে, বিখ্যাত পণ্ডিত ইমাম মুওয়াফ্‌ফকের কাছে একই সময়ে তিনজন অসাধারণ মেধাবী ছাত্র শিক্ষালাভ করেন। এঁদের ভিতর খেলাচ্ছলে চুক্তি হয় যে, এঁদের কোনো একজন পরবর্তী জীবনে প্রভাবশালী হতে পারলে তিনি অন্য দু'জনকে সাহায্য করবেন। এঁদের একজন কালক্রমে প্রধান মন্ত্রী বা নিজাম-উল্‌-মুল্ক-এর পদ প্রাপ্ত হন। খবর পেয়ে দ্বিতীয় বন্ধু হাসন বিন্ সববাহ তাঁর কাছে এসে তাঁর পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দিয়ে উচ্চ রাজকর্ম চান। বন্ধুর কৃপায় আশাতীত উচ্চপদ পেয়েও হাসন তাঁকে সরিয়ে নিজে প্রধান মন্ত্রী হবার জন্য ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। কিন্তু শেষটায় ধরা পড়ে বাদশার হুকুমেই রাজপ্রাসাদ থেকে বহিষ্কৃত হন। হাসন প্রতিশোধ নেবার জন্য এক গুপ্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে গোপন আততায়ী দিয়ে অনেক লোককে হত্যা করিয়ে প্রচুর অর্থ ও প্রতিপত্তি অর্জন করেন। ক্রুসেডের একাধিক খৃষ্টান নেতা এইসব গুপ্তঘাতকের হস্তে প্রাণ দেন। এরা ভাঙ জাতীয় এক প্রকার হশীশ্ সেবন করতো বলে এদের নাম হয়েছিল 'হশীশীয়ূন' এবং ইংরিজি 'এ্যাসাসিন'—গুপ্তঘাতক—এই শব্দ থেকেই অর্বাচীন লাতিন তথা ফরাসীর মাধ্যমে এসেছে। অনেকে বলেন, পরবর্তীকালে নিজাম-উল্-মুল্ক যে গুপ্তঘাতকের হস্তে প্রাণ দেন, সেও হাসন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এদের সম্বন্ধে লেখকের 'অরিজিন অব দি খোজা' পুস্তক লেখকের বাল্য রচনা বলে দ্রষ্টব্যের মধ্যে ধর্তব্য নয়।

ওমরকে যখন নিজাম-উল্-মুল্ক উচ্চপদ দিতে চাইলেন তখন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে নির্জনে অনটনবিহীন জীবনযাপনের সুবিধাটুকু মাত্র চাইলেন। এতো জানা কথা। যে ব্যক্তি স্বর্গ-সুখ বলতে বোঝে,

সেই নিরালা পাতায় ঘেরা বনের ধারে শীতল ছায়.
খাদ্য কিছু, পেয়ালা হাতে, ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়।
মৌন ভাঙ্গি মোর পাশেতে গুঞ্জে তব মঞ্জু সুর—
সেই তো সখি স্বপ্ন আমার, সেই বনানী স্বর্গপুর॥

(কান্তি ঘোষ)

কিম্বা—

আমার সাথে আসবে যেথায়—দূর সে রেখে সহরগ্রাম
এক ধারেতে মরু তাহার, আর একদিকে শষ্প শ্যাম।
বাদশা-নফর নাইকো সেথা—রাজ্য-নীতির চিন্তা-ভার;
মামুদ শাহ?—দূরে থেকেই করব তাঁকে নমস্কার।

(কান্তি ঘোষ)

তার রাজপদ নিয়ে কি হবে? নিজাম-উল্-মুল্ক বিচক্ষণ লোক ছিলেন, বুঝতে পারলেন, ওমরের খ্যাতি-প্রতিপত্তি প্রত্যাখ্যান মৌখিক বিনয় নয় এবং তাঁর জন্য সচ্ছল জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করে দিলেন। কবিও কখনো তাঁর মত পরিবর্তন করেন নি। বস্তুতঃ তাঁর কাব্যের মূল সুর ঐটিই।

কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর ডাক পড়লো রাজদরবারে—পঞ্জিকা সংশোধন করে দেবার জন্য। 'ইরানীদের নওরোজ' বা নববর্ষ আসে বসন্ত ঋতুতে, কিন্তু বহু শত বৎসর লীপ ইয়ার গোণা হয়নি বলে তখন আর নববর্ষ বসন্ত ঋতুতে আসছিল না। ওমর ঐ কর্মটি সুচারুরূপে সম্পন্ন ক'রে দিলেন।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, কবিরূপে যে ব্যক্তি বিশ্বজগতে বিখ্যাত তিনি আসলে ছিলেন বৈজ্ঞানিক। শুধু তাই নয়, ফিটজিরাল্ডের মাধ্যমে ইয়োরোপে প্রচারিত হবার পূর্বেই ওমরের বিজ্ঞান চর্চা ফ্রান্সে অনূদিত হয়ে সেখানে তাঁর খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। বর্তমান লেখক এসব লেখা দেখবার সুযোগ পায়নি, তাই এনসাইক্লোপিডিয়ার 'কোনিক্ সেক্শন' অনুচ্ছেদ থেকে ইয়োরোপে ওমরের বৈজ্ঞানিক যশ সম্বন্ধে উদ্ধৃতি দিচ্ছি:—

"Greek mathematics culminated in Apollonius. Little further advance was possible without new methods and higher points of view. Much later, Arabs and other Muslims absorbed the classical science greedily; it was the Persian poet Omar Khayyam, one of the most prominent mediaeval mathematicians, with his remarkable classification and systematic study of equations, which he emphasized, who blazed the way to the modern union of analysis and geometry. In his "Algebra" he considered the cubic as soluble only by the intersection of conics, and the biquadratic not at all."

শেষ ছত্রটির বাঙলায় অনুবাদ মূল ইংরিজি, এমন কি আধুনিক বাঙলা কবিতার চেয়েও শক্ত হয়ে যাবে বলে গোটা টুকরোটাই অতি অনিচ্ছায় ইংরিজিতেই রেখে দিতে বাধ্য হলুম। বৈজ্ঞানিক পাঠক বিনা অনুবাদেই এটি বুঝতে পারবেন, প্রাঞ্জল অনুবাদেও আমাদের মত অবৈজ্ঞানিকের কোনো লাভ হবে না।

ইরানের অধিকাংশ গুণীই একমত যে, ওমর তাঁর জীবনের প্রায় সব সময়টুকুই কাটিয়েছেন বিজ্ঞানচর্চায় এবং অতি অল্প সামান্য সময় 'নষ্ট' করেছেন কাব্যলক্ষ্মীর আরাধনায়। তাই দীর্ঘ কবিতা লেখবার ফুরসৎ তাঁর হয়ে ওঠেনি—এমন কি রুবাঈগুলোও গীতিরস দিয়ে সরস করবার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন নি।

গণিত এবং বিশেষ করে জ্যোতিষ চর্চার ফল ওমরের কাব্যে পদে পদে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ গ্রহ-নক্ষত্র যে অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিয়মে চলে তার থেকেই তিনি দৃঢ় মীমাংসায় উপনীত হন যে, মানুষেরও কোনো প্রকারের স্বাধীনতা নেই, তার কর্মপদ্ধতি স্বেচ্ছায় নিয়ন্ত্রণ করার কোনো অধিকারই সে পায় নি তাই

প্রথম মাটিতে গড়া হয়ে গেছে শেষ মানুষের কায়
শেষ নবান্ন হবে যে ধান্যে তারো বীজ আছে তায়।
সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাতে লিখে রেখে গেছে তাই,
বিচার-কর্ত্রী প্রলয় রাত্রি পাঠ যা করিবে ভাই।

(সতোন দত্ত)

পৃথ্বী হ'তে দিলাম পাড়ি, নভঃগ্রহে মনটা লীন—
সপ্ত-ঋষি যেথায় বসি ঘুমিয়ে কাটান রাত্রি দিন।
বিদ্যাটা মোর উঠলো ফেঁপে কাটলো কত ধাঁধার ঘোর—
মৃত্যুটা আর ভাগ্য লিখন—ওইখানে গোল রইল মোর।

(কান্তি ঘোষ)

কিন্তু এস্থলে আমি ওমর-কাব্যের মল্লিনাথ হবার দুরাশা নিয়ে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হইনি। ওমরের নামে প্রচলিত প্রায় ছ'শ'টি রুবাইয়াৎ ইরানী বটতলাতেও পাওয়া যায়—পার্টিশনের পূর্বে কলকাতার ফার্সী বটতলা তালতলা অঞ্চলেও পাওয়া যেত। তার অতি অল্পই অনুবাদ করেছেন ফিটস্‌জেরাল্ড এবং সেই ছ' শ'-র কটি কবিতা ওমরের নিজস্ব, তাই নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বাক্-বিতণ্ডা এখনো শেষ হয়নি—আমার বিশ্বাস কখনো হবে না। সেই ছ'শ' চতুষ্পদীর টীকা পড়ার উৎসাহ ও ধৈর্য রসিকজনের থাকার কথা নয়—পণ্ডিতের থাকতে পারে। আমি রসিকের সেবা করি।

তাই আমিও ওমরের সামান্যতম ঐতিহাসিক পটভূমি নির্মাণ করার চেষ্টা করেছি এবং তাও শুধু ওমরের বিদ্রোহী মনোভাব দেখাবার জন্য—কারণ ঐখানেই নজরুল ইসলামের সঙ্গে তিনি সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন।

ওমরের প্রধান বিদ্রোহ ধর্মগুরুদের বিরুদ্ধে:—

খা'জা! তোমার দরবারে মোর একটি শুধু আর্জি এই
থামাও উপদেশের ঘটা, মুক্তি আমার এই পথেই।
দৃষ্টি-দোষে দেখছ বাঁকা আমার সোজা সরল পথ,
আমায় ছেড়ে ভালো করো, ঝাপসা তোমার চক্ষুকেই।

(কাজী সাহেবের অনুবাদ)

O master! grant us only this, we prithee;
Preach not! But mutely guide to bliss, we prithee!
"We walk not straight"—Nay, it is thou who squintest!
Go, heal thy sight, and leave us in peace, we prithee!

(কার্ণের অনুবাদ)

পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক রাজা-রাজড়ার শৌর্যবীর্য নিয়ে যে সব কবি ফিরদৌসীর ন্যায় আস্ফালন করে বর্তমানের আনন্দকে অবহেলা করতেন তাঁদের সম্বন্ধে বলছেন—

ভাগ্য-লিপি মিথ্যা সে নয়—ফুরোয় যা' তা ফুরিয়ে যাক্,
কৈকোবাদ আর কৈখসুরুর ইতিহাসের নামটা থাক।
রুস্তম আর হাতেম-তায়ের কল্পকথা—স্মৃতির ফাঁস—
সে-সব খেয়াল ঘুচিয়ে দিয়ে আজকে এস আমার পাশ।

(কান্তি ঘোষ)

দরবেশ-সূফীরা করতেন কৃচ্ছ্রসাধন এবং যোগচর্চা। পূর্বেই নিবেদন করেছি, তাঁরা নৃত্যের সঙ্গে চীৎকার করে করতেন নাম-জপ, তাঁদের বিশ্বাস, ঐ করেই ভগবদ্‌প্রেম এবং চরম মোক্ষ পাওয়া যায়।

দ্রাক্ষালতার শিকড় সেটি তার না জানি কতই গুণ—
জড়িয়ে আছেন অস্থিতে মোর দরবেশী সাঁই যাই বলুন—
গগনভেদী চীৎকারে তাঁর খুলবে নাকো মুক্তি দ্বার,
অস্থিতে এই মিলবে যে খোঁজ সেই দুয়ারের কুঞ্জিকার।

(কান্তি ঘোষ)

কিন্তু সবচেয়ে বেশী চতুষ্পদী তিনি রচনা করেছেন দার্শনিক এবং পণ্ডিতদের বিরুদ্ধে। সেখানে তিনি জ্যোতির্বিদ ওমরকেও বাদ দেননি।

অস্তি-নাস্তি শেষ করেছি, দার্শনিকের গভীর জ্ঞান
বীজগণিতের সূত্র-রেখা যৌবনে মোর ছিলই ধ্যান;
বিদ্যারসে যতই ডুবি, মনটা জানে মনে (মানে?) স্থির—
দ্রাক্ষারসের জ্ঞানটা ছাড়া রসজ্ঞানে নই গভীর।

(কান্তি ঘোষ)

অর্থহীন, অর্থহীন, সমস্তই অর্থহীন। তাই ওমরের বার বার কাতর রোদন, দরদী ফরিয়াদ—

হেথায় আমার আসাতে প্রভু হন নি তো লাভবান
চলে যাবো যবে হবেন না তিনি কোনো মতে গরীয়ান।
এ কর্ণে আমি শুনিনি তো কভু কোনো মানবের কাছে
এই আসা-যাওয়া কি এর অর্থ—খামখা পোড়েন টান।

(লেখক)

তাই ওমরের শেষ মীমাংসা—একবার মরে যাবার পর তুমি আর এখানে ফিরে আসবে না। অতএব যতটুকু পারো, যতক্ষণ পারো দর্শন-বিজ্ঞান-সাঁই-সূফীদের ভুলে গিয়ে সাকী সুরা নিয়ে নির্জন কোণে আনন্দ করো।

মৃত্যু আসিয়া মস্তকে মোর আঘাত করার আগে
লে আও শরাব—লাও ঝটপট—রাঙানো গোলাপী রাগে।
হায়রে মূর্খ! সোনা দিয়ে মাজা তোর কি শরীর খানা—?
গোর হয়ে গেলে ফের খুঁড়ে নেবে—? ও ছাই কি কাজে লাগে।

(লেখক)

কিন্তু একটা জিনিষ ভুল করলে চলবে না। ওমর খাঁটি চার্বাকপন্থী এবং ঐ জাতীয় লোকায়তীদের মত নন। 'ঋণ ক'রে ঘি খাও, কারণ দেহ ভস্মীভূত হলে ঋণ তো আর শোধ করতে হবে না,' অর্থাৎ ইহ সংসারে কিম্বা পরলোকে অন্য কারো প্রতি তোমার কোনো নৈতিক দায়িত্ব—মরাল রেসপন সিবিলিটি নেই—এ তত্ত্বেও ওমর বিশ্বাস করতেন না। তাই তাঁর একমাত্র উপদেশ—

কারুর প্রাণে দুখ্ দিও না, করো বরং হাজার পাপ,
পরের মনে শান্তি নাশি বাড়িও না আর মনস্তাপ।
অমর-আশিস্ লাভের আশা রয় যদি, হে বন্ধু মোর,
আপনি স'য়ে ব্যথা, মুছো পরের বুকের ব্যথার ছাপ।

(নজরুল ইসলাম)

গুণীরা বলেন, 'কুরানই কুরানের সর্বশ্রেষ্ঠ টীকা।' তরুণদের আমি প্রায়ই বলি, 'রবীন্দ্রনাথের রচনাই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ টীকা—ঐ কাব্যই বার বার অধ্যয়ন করো, অন্য টীকার প্রয়োজন নাই।' ওমরই ওমরের সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লিনাথ এবং কাজীর অনুবাদ সকল অনুবাদের কাজী।

—সৈয়দ মুজতবা আলী



রাতের আঁচল দীর্ণ করে আসল শুভ ঐ প্রভাত,
জাগো সাকী! সকাল বেলার খোঁয়ারি ভাঙো আমার সাথ।
ভোলো ভোলো বিষাদ-স্মৃতি! এমনি প্রভাত আসবে ঢের,
খুঁজতে মোদের এইখানে ফের, করবে করুণ নয়নপাত।



[২]

আঁধার অন্তরীক্ষে বুনে যখন রূপার পাড় প্রভাত,
পাখীর বিলাপ-ধ্বনি কেন শুনি তখন অকস্মাৎ?
তারা যেন দেখতে বলে উজল প্রাতের আরশিতে—
ছন্নছাড়া তোর জীবনের কাটল কেমন একটি রাত!

[৩]

"ঘুমিয়ে কেন জীবন কাটাস?" কইল ঋষি স্বপ্নে মোর,
"আনন্দ-গুল্ প্রস্ফুটিত করতে পারে ঘুম কি তোর?
ঘুম মৃত্যুর যমজ-ভ্রাতা তার সাথে ভাব করিসনে,
ঘুম দিতে ঢের পাবি সময় কবরে তোর জনম-ভোর।"

[৪]

আমার আজের রাতের খোরাক তোর টুকটুক শীরীন ঠোঁট
গজল শোনাও, শিরাজী দাও, তন্বী সাকী জেগে ওঠ!
লাজ-রাঙা তোর গালের মত দে গোলাপী-রঙ শরাব,
মনে ব্যথার বিনুনী মোর খোঁপায় যেমন তোর চুনোট।

[৫]

প্রভাত হ'ল। শরাব দিয়ে করব সতেজ হৃদয়-পুর,
যশোখ্যাতির ঠুনকো এ কাচ করব ভেঙে চাখ্‌নাচুর।
অনেক দিনের সাধ আশা এক নিমেষে করব ত্যাগ,
পরব প্রিয়ার বেণী বাঁধন, ধরব বেণুর বিধুর সুর!

[৬]

ওঠো, নাচো! আমরা প্রচুর কর্‌ব তারিফ মদ-অলস
ঐ নার্গিস্‌ আঁখির তোমার, ঢালবে তুমি আঙুর-রস!
এমন কী আর—যদিই তাহা পান করি দশ বিশ গেলাস,
ছয় দশে ষাট পাত্র পড়লে খানিকটা হয় দিল সরস!

[৭]

তোমার রাঙা ঠোঁটে আছে অমৃত-কূপ প্রাণ-সুধার,
পিয়ালার ঠোঁট যেন গো ছোঁয় না, প্রিয়া, ঠোঁট তোমার!
ঐ পিয়ালার রক্ত যদি পান না করি, শাপ দিও,
তোমার অধর স্পর্শ করে এত বড় স্পর্ধা তার!

[৮]

আজকে তোমার গোলাপ-বাগে ফুটল যখন রঙীন গুল্,
রেখো না পান-পাত্র বেকার, উপচে পড়ুক সুখ ফজুল।
পান করে নে, সময় ভীষণ অবিশ্বাসী, শত্রু ঘোর,
হয়ত এমন ফুল-মাখানো দিন পাবি না আজের তুল।

[৯]

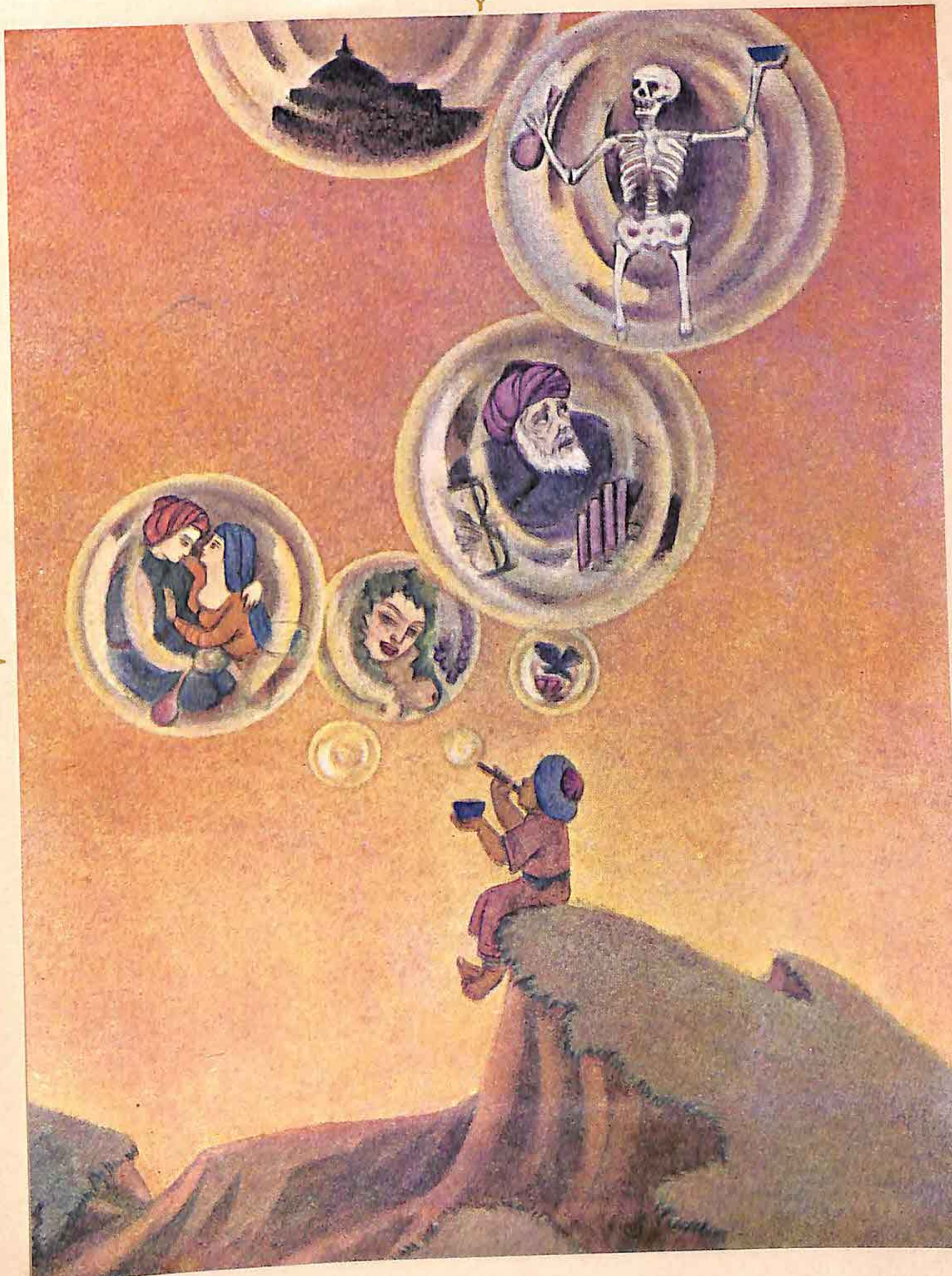
শরাব আনো! বক্ষে আমার খুশির তুফান দেয় যে দোল্।
স্বপ্ন-চপল ভাগ্যলক্ষ্মী জাগল জাগো ঘুম-বিভোল!
মোদের শুভদিন চলে যায় পারদ-সম ব্যস্ত পা'য়,
যৌবনের এই বহ্নি নিভে খোঁজে নদীর শীতল কোল।

[১০]

আমরা পথিক ধূলির পথের, ভ্রমি শুধু একটি দিন,
লাভের অঙ্ক হিসাব করে পাই শুধু দুখ, মুখ মলিন।
খুঁজতে গিয়ে এই জীবনের রহস্যেরই কূল বৃথাই
অপূর্ণ সাধ আশা লয়ে হবই মৃত্যুর অঙ্কলীন।

[১১]

ধরায় প্রথম এলাম নিয়ে বিস্ময় আর কৌতূহল,
তারপর—এ জীবন দেখি কল্পনা, আঁধার অতল।
ইচ্ছা থাক কি না থাক, শেষে যেতেই হবে, তাই বলি—
এই যে জীবন আসা-যাওয়া আঁধার ধাঁধার জট কেবল!



[১২]

রহস্য শোন সেই সে লোকের আত্মা যথায় বিরাজে,
ওরে মানব! নিখিল সৃষ্টি লুকিয়ে আছে তোর মাঝে।
তুই-ই মানুষ, তুই-ই পশু, দেবতা দানব স্বর্গদূত,
যখন হতে চাইবি রে যা হতে পারিস তুই তা যে।

[১৩]

স্রষ্টা যদি মত নিত মোর—আসতাম না প্রাণান্তেও,
এই ধরাতে এসে আবার যাবার ইচ্ছা নেই মোটেও।
সংক্ষেপে কই, চিরতরে নাশ করতাম সমূলে
যাওয়া-আসা জন্ম আমার; সেও শূন্য শূন্য এও!

[১৪]

আত্মা আমার! খুলতে যদি পারতিস এই অস্থিমাস
মুক্ত পাখায় দেবতা-সম পালিয়ে যেতিস্ দূর আকাশ।
লজ্জা কি তোর হ'ল না রে, ছেড়ে তোর ঐ জ্যোতির্লোক
ভিন্-দেশী প্রায় বাস করতে এলি ধরার এই আবাস?

[১৫]

সকল গোপন তত্ত্ব জেনেও পার্থিব এই আবহাওয়ার
মিথ্যা ভয়ের ভয় গেল না? নিত্য ভয়ের হও শিকার?
জানি স্বাধীন ইচ্ছামত যায় না চলা এই ধরায়,
যতটুকু সময় তবু পাও হাতে, লও সুযোগ তার।

[১৬]

ব্যথায় শান্তি লাভের তরে থাকত যদি কোথাও স্থান
শ্রান্ত পথের পথিক মোরা সেথায় জুড়াতাম এ প্রাণ।
শীত-জর্জর হাজার বছর পরে নবীন বসন্তে
ফুলের মত উঠত ফুটে মোদের জীবন-মুকুল ম্লান।

[১৭]

বুলবুলি এক হালকা পাখায় উড়ে যেতে গুলিস্তান,
দেখল হাসিখুশী ভরা গোলাপ লিলির ফুল-বাথান।
আনন্দে সে উঠল গাহি, "মিটিয়ে নে সাধ এই বেলা,
ভোগ করতে এমন দিন আর পাবিনে তুই ফিরিয়ে প্রাণ!"

[১৮]

রূপ-মাধুরীর মায়ায় তোমার য'দিন পার, লো প্রিয়া,
তোমার প্রেমিক বধূরে ব্যথা হরণ করো প্রেম দিয়া!
রূপ-লাবণীর সম্ভার এই রইবে না সে চিরকাল,
ফিরবে না আর তোমার কাছে যায় যদি বিদায় নিয়া।

[১৯]

সাকী! আনো আমার হাতে মদ-পেয়ালা, ধরতে দাও!
প্রিয়ার মতন ও মদ-মদির সুরত-ওয়ালী ধরতে দাও!
জ্ঞানী এবং অজ্ঞানীরে বেঁধে যা' দেয় গাঁট-ছড়ায়,
সেই শরাবের শিকল, সাকী, আমায় খালি পরতে দাও।

[২০]

নীল আকাশের নয়ন ছেপে বাদল-অশ্রুজল ঝরে,
না পেলে আজ এই পানীয় ফুটত না ফুল বন ভরে।
চোখ জুড়াল আমার যেমন আজ এ ফোটা ফুলগুলি,
মোর কবরে ফুটবে যে ফুল—কে জানে হায় কার তরে!

[২১]

করব এতোই শীরাজী পান পাত্র এবং পরাণ ভোর
তীব্র-মিঠে খোশবো তাহার-উঠবে আমার ছাপিয়ে গোর।
থম্‌কে যাবে চলতে পথিক আমার গোরের পাশ দিয়ে,
ঝিমিয়ে শেষে পড়বে নেশায় মাতাল-করা গন্ধে ওর।



[২২]

দেখতে পাবে যেথায় তুমি গোলাপ লালা ফুলের ভিড়,
জেনো, সেথায় ঝরেছিল কোনো শাহানশা'র রুধির।
নার্গিস আর গুল-বনোসা'র দেখবে যেথায় সুনীল দল,
ঘুমিয়ে আছে সেথায়—গালে তিল ছিল যে সুন্দরীর।

[২৩]

নিদ্রা যেতে হবে গোরে অনন্তকাল, মদ পিও!
থাকবে নাকো সাথী সেথায় বন্ধু প্রিয় আত্মীয়।
আবার বলতে আসব না ভাই বলছি যা তা রাখ্ শুনে—
ঝরেছে যে ফুলের মুকুল, ফুটতে পারে আর কি ও?

[২৪]

বিদায় নিয়ে আগে যারা গেছে চলে, হে সাকী,
চির ঘুমে ঘুমায় তারা মাটির তলে, হে সাকী!
শরাব আনো, আসল সত্য আমার কাছে যাও শুনে,
তাদের যত তথ্য গেল হাওয়ায় গলে, হে সাকী!

[২৫]

তুমি আমি জন্মিনিকো—যখন শুধু বিরাম-হীন
নিশীথিনীর গলা ধরে ফিরতো হেথায় উজল দিন;—
বন্ধু, ধীরে চরণ ফেলো! কাজল-আঁখি সুন্দরীর
আঁখির তারা আছে হেথায় হয়ত ধূলির অঙ্কলীন!

[২৬]

প্রথম থেকেই আছে লেখা অদৃষ্টে তোর যা হবার,
তাঁর সে কলম দিয়ে—যিনি দুঃখে সুখে নির্বিকার।
স্রেফ্ বোকামি, কান্নাকাটি লড়তে যাওয়া তাঁর সাথে,
বিধির লিখন ললাট-লিপি টলবে না যা জন্মে আর!

[২৭]

ভালো করেই জানি আমি, আছে এক রহস্য-লোক,
যায় না বলা সকলকে তা ভালোই হোক কি মন্দ হোক।
আমার কথা ধোঁয়ায় ভরা, ভাঙতে তবু পারবো না—
থাকি সে কোন গোপন-লোকে দেখতে যাহা পায় না চোখ।

[২৮]

চলবে নাকো মেকি টাকার কারবার আর, মোল্লাজি!
মোদের আবাস সাফ করে নেয় শেয়ান-ঝাড়ুর কারসাজি।
বেরিয়ে ভাঁটি-খানার থেকে বলল হেঁকে বৃদ্ধ পীর—
"অনন্ত ঘুম ঘুমাবি কাল পান করে নে মদ আজি!"

[২৯]

সবকে পারি ফাঁকি দিতে মনকে পারি ঠারতে চোখ,
খোদার উপর খোদকারিতে ব্যর্থ হয় এ মিছে স্তোক।
তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম বুদ্ধি দিয়ে জাল বুনিলাম চাতুর্যের,
মুহূর্তে তা দিল ছিঁড়ে হিংস্র নিয়তির সে নোখ!

[৩০]

মৃত্তিকা-লীন হবার আগে নিয়তির নিঠুর করে
বেঁচে নে তুই, মৃত্যু-পাত্র আসছে রে ঐ তোর তরে!
হেথায় কিছু যোগাড় করে নে রে, হোথায় কেউ সে নাই
তাদের তরে—শূন্য হাতে যায় যাহারা সেই ঘরে।

[৩১]

বলতে পারো, অসার-শূন্য ভবের হাটের এই ঘরে
জ্ঞান-বিলাসী সুধীজনের হৃদয় কেন রয় পড়ে?
যেই তাহারা শ্রান্ত হয়ে এই সে ঘরের শান্তি চায়,
'সময় হ'ল চল্ ওরে' কয় অমনি মরণ হাত ধরে!



[৩২]

খাজা! তোমার দরবারে মোর একটি শুধু আর্জি এই—
থামাও উপদেশের ঘটা, মুক্তি আমার এই পথেই।
দৃষ্টি-দোষে দেখছ বাঁকা আমার সোজা সরল পথ,
আমায় ছেড়ে ভালো করো ঝাপসা তোমার চক্ষুকেই।

[৩৩]

কাল কি হবে কেউ জানে না দেখছ ত হায় বন্ধু মোর!
নগদ মধু লুঠ করে লও, মোছ মোছ অশ্রু-লোর।
চাঁদনি-তরল শরাব পিও, হায়, সুন্দর এই সে চাঁদ
দীপ জ্বালিয়ে খুঁজবে বৃথাই কাল এ শূন্য ধরার ক্রোড়!

[৩৪]

প্রেমিকরা সব আমার মতো মাতুক প্রেমের মত্ততায়,
দ্রাক্ষা-রসের দীক্ষা নিয়ে আচার-নীতি দলুক পায়।
থাকি যখন শাদা চোখে, সব কথাতে রুষ্ট হই,
শরাব পিয়ে দিল-দরিয়া উড়িয়ে দি ভয়-ভাবনায়।

[৩৫]

মানব-দেহ — রঙে-রূপে এই অপরূপ ঘরখানি—
স্বর্গের সে শিল্পী কেন করল সৃজন কী জানি,
এই 'লালা-রুখ', বল্লী-তনু ফুল্ল-কপোল তন্বীদের
সাজাতে হায় ভঙ্গুর এই মাটির ধরার ফুলদানি!

[৩৬]

তিন ভাগ জল এক ভাগ থল এই পৃথিবীর এও মায়া,
এ ধরাতে দেখছ যা তার সকল-কিছু সব মায়া,
এই যে তুমি বলছ যা সব, শুনছ কলরব—মায়া।
গোপন প্রকাশ সত্য মিথ্যা এ সব অবাস্তব মায়া

[৩৭]

দোষ দেয় আর ভৎসে সবাই আমার পাপের নাম নিয়া,
আমার দেবী-প্রতিমারে পূজি তবু প্রাণ দিয়া।
মরতে যদি হয় গো আমায় শরাব-পানের মজলিশে—
স্বর্গ-নরক সমান, পাশে থাকবে শরাব আর প্রিয়া।

[৩৮]

মুসাফিরের এক রাত্রির পান্থ-বাস এ পৃথ্বীতল—
রাত্রি-দিবার চিত্র-লেখা চন্দ্রাতপ আঁধার-উজল।
বসল হাজার জামশেদ ঐ উৎসবেরই আঙ্গিনায়
লাখ বাহ্‌রাম এই আসনে বসে হ'ল বেদখল।

[৩৯]

কারুর প্রাণে দুখ দিও না, করো বরং হাজার পাপ,
পরের মনের শান্তি নাশি বাড়িও না তার মনস্তাপ।
অমর-আশিস্ লাভের আশা রয় যদি, হে বন্ধু মোর,
আপনি সয়ে ব্যথা, মুছো পরের বুকের ব্যথার ছাপ।

[৪০]

ছেড়ে দে তুই নীরস বাজে দর্শন শাস্ত্রপাঠ,
তার চেয়ে তুই দর্শন কর প্রিয়ার বিনোদ বেণীর ঠাট্,
ঐ সোরাহির হৃদয়-রুধির নিষ্কাশিয়া পাত্রে ঢাল্,
কে জানে তোর রুধির পিয়ে কখন মৃত্যু হয় লোপাট।

[৪১]

অজ্ঞানেরই তিমির-তলের মানুষ ওরে বে-খবর!
শূন্য তোরা, বুনিয়াদ তোর গাঁথা শূন্য হাওয়ার পর।
ঘুরিস অতল অগাধ খাদে, শূন্য মায়ার শূন্যতায়,
পশ্চাতে তোর অতল শূন্য, অগ্রে শূন্য অসীম চর।



[৪২]

লয়ে শরাব-পাত্র হাতে পিই যবে তা মস্ত হয়ে
জ্ঞান-হারা হই সেই পুলকের তীব্র-ঘোর বেদন সয়ে,
কি যেন এক মন্ত্র-বলে যায় ঘটে কি অলৌকিক,
প্রোজ্জ্বল মোর জ্ঞান গলে, যায় ঝর্ণা-সম গান বয়ে।

[৪৩]

"শরাব ভীষণ খারাপ জিনিস মদ্যপায়ীর নেইকো ত্রাণ।"
ডাইনে বাঁয়ে দোষদর্শী সমালোচক ভয় দেখান—
সত্য কথাই! যে আঙুরে নষ্ট করে ধর্মমত,
সবার উচিত—নিঙড়ে ওরে করে উহার রক্ত পান!

[৪৪]

আমার কাছে শোন উপদেশ—কাউকে কভু বলিসনে—
মিথ্যা ধরায় কাউকে প্রাণের বন্ধু মেনে চলিসনে!
দুঃখ ব্যথায় টলিসনে তুই, খুঁজিসনে তার প্রতিষেধ,
চাসনে ব্যথার সমব্যথী, শির উঁচু রাখ টলিসনে!

[৪৫]

মউজ চলুক! লেখার যা তা লিখল ভাগ্য কালকে তোর,
ভুলেও কেহ পুছল না কি থাকতে পারে তোর ওজর!
ভদ্রতারও অনুমতি কেউ নিল না অমনি ব্যস্
ঠিক ঠাক সব হয়ে গেল ভুগবি কেমন জীবন-ভোর!

[৪৬]

সেই সাথে চাই—সৃষ্টি-খাতায় দিক কেটে সে আমার নাম,
আমি চাহি স্রষ্টা আবার সৃজন করুন শ্রেষ্ঠতর
আকাশ ভুবন এই এখনই, এই সে আমার আঁখির 'পর।
কিংবা আমার যা প্রয়োজন তা মিটাবার দিক সে বর।

[৪৭]

নাস্তিক আর কাফের বলো তোমরা লয়ে আমার নাম
কুৎসা গ্লানির পঙ্কিল স্রোত বহাও হেথা অবিশ্রাম।
অস্বীকার তা করব না যা ভুল করে যাই, কিন্তু ভাই,
কুৎসিত এই গালি দিয়েই তোমরা যাবে স্বর্গধাম?

[৪৮]

বদখশানী রক্ত-চূণীর মতন সুরা চুঁইয়ে আন্
তপ্তহিয়ার আনন্দ যা, শান্ত যাহে দগ্ধ প্রাণ।
মুসলমানের তরে শরাব হারাম নাকি, সবাই কয়,
বলতে পারে তাদের কেহ — আছে কি আর মুসলমান?

[৪৯]

মস্‌জিদ মন্দির গির্জায় ইহুদ-খানায় মাদ্রাসায়
রাত্রি-দিবস নরক-ভীতি স্বর্গ-সুখের লোভ দেখায়।
ভেদ জানে আর খোঁজ রাখে ভাই খোদার যারা রহস্যের
ভোলে না এই খোশ-গল্পের ঘুম-পাড়ানো কল্পনায়।

[৫০]

এক হাতে মোর তস্‌বী খোদার, আর-হাতে মোর লাল গেলাস,
অর্ধেক মোর পুণ্য-স্নাত, আধেক পাপে করল গ্রাস।
পুরোপুরি কাফের নহি, নহি খাঁটি মুসলিমও—
করুণ চোখে হেরে আমায় তাই ফিরোজা নীল আকাশ!

[৫১]

একমণী ঐ মদের জালা গিলব, যদি পাই তাকে,
যে জালাতে প্রাণের জ্বালা নেভাবার ওষুধ থাকে!
পুরানো ঐ যুক্তি তর্কে দিয়ে আমি তিন তালাক,
নতুন করে করব নিকাহ্‌ আঙুর-লতার কন্যাকে।



[৫২]

বিষাদের ঐ সওদা নিয়ে বেড়িয়ো না ভাই শিরোপরি,
আঙুর-কন্যা সুরার সাথে প্রেম ক'রে যাও প্রাণ ভরি!
নিষিদ্ধা ঐ কন্যা, তবু হোক সে যতই অ-সতী,
তাহার সতী মায়ের চেয়ে ঢের বেশী সে সুন্দরী!

[৫৩]

স্বর্গে পাব শরাব-সুধা এ যে কড়ার খোদ খোদার,
ধরায় তাহা পান করলে পাপ হয়, এ কোন্ বিচার?
'হাম্জা' সাথে বেয়াদবি করল মাতাল এক আরব,—
তুচ্ছ কারণ—শরাব হারাম তাই হুকুমে 'মোস্তফার'!

[৫৪]

''রজব শাবান পবিত্র মাস" বলে গোঁড়া মুসলমান,
"সাবধান, এই দু' মাস ভাই কেউ ক'রো না শরাব পান।"
খোদা এবং তার রসুলের 'রজব' 'শাবান' এই দু' মাস
পান-পিয়াসীর তরে তবে সৃষ্ট বুঝি এ 'রমজান'?

[৫৫]

শুক্রবার আজ, বলে সবাই পবিত্র নাম জুম্মা যার,
হাত যেন ভাই খালি না যায়, শরাব চলুক আজ দেদার।
এক পেয়ালি শরাব যদি পান করো ভাই অন্যদিন,
দু'পেয়ালি পান করো আজ বারের বাদশা জুম্মা বার।

[৫৬]

মস্‌জিদের অযোগ্য আমি, গির্জার আমি শত্রু-প্রায়,
ওগো প্রভু, কোন মাটিতে করলে সৃজন এই আমায়?
সংশয়াত্মা সাধু কিংবা ঘৃণ্য নগর-নারীর তুল
নাই স্বর্গের আশা আমার, শান্তি নাহি এই ধরায়।

[৫৭]

মুগ্ধ করো নিখিল-হৃদয় প্রেম-নিবেদন কৌশলে
হৃদয়-জয়ী হে বীর, উড়াও নিশান প্রিয়ার অঞ্চলে।
এক হৃদয়ের সমান নহে, লক্ষ মস্‌জিদ আর কাবা
কি হবে তোর তীর্থে 'কাবা'র শান্তি খোঁজ হৃদয় তলে।

[৫৮]

বিধর্মীদের ধর্মপথে আসতে লাগে এক নিমেষ,
সন্দেহেরই বিপথ-ফেরত বিবেক জাগে এক নিমেষ।
দুর্লভ এই নিমেষটুকু ভোগ করে নাও প্রাণ ভরে,
এই ক্ষণিকের আয়েশ দিয়ে জীবন ভাসে এক নিমেষ।

[৫৯]

হৃদয় যাদের অমর প্রেমের জ্যোতির্ধারায় দীপ্তিমান,
মসজিদ্ মন্দির গির্জা, যথাই করুক অর্ঘ্য দান—
প্রেমের খাতায় থাকে লেখা অমর হয়ে তাদের নাম,
স্বর্গের লোভ ও নরক-ভীতির ঊর্ধ্বে তারা মুক্ত-প্রাণ।

[৬০]

মদ পিও আর ফুর্তি করো—আমার সত্য আইন এই!
পাপ পুণ্যের খোঁজ রাখি না—স্বতন্ত্র মোর ধর্ম সেই।
ভাগ্য সাথে বিয়ের দিনে কইনু, "দিব কি যৌতুক?"
কইল বধূ, "খুশি থাকো, তার বড় যৌতুক সে নেই!"

[৬১]

এক সোরাহি সুরা দিও, একটু রুটির ছিল্‌কে আর
প্রিয়া সাকী, তাহার সাথে একখানি বই কবিতার,
জীর্ণ আমার জীবন জুড়ে রইবে প্রিয়া আমার সাথ,
এই যদি পাই চাইব নাকো তখ্‌ৎ আমি শাহনশার!



[৬২]

হূরী বলে থাকলে কিছু—একটি হূরী, মদ খানিক,
ঘাস-বিছানো ঝর্ণাতীরে, অল্প-বয়েস, বৈতালিক—
এই যদি পাস, স্বর্গ নামক পুরনো সেই নরকটায়,
চাসনে যেতে: স্বর্গ ইহাই, স্বর্গ যদি থাকেই ঠিক।

[৬৩]

যতক্ষণ এ হাতের কাছে আছে অঢেল লাল শরাব
গেহুঁর রুটি, গরম কোর্মা কালিয়া আর শিক-কাবাব,
আর লালা-রুখ্ প্রিয়া আমার কুটীর-শয়ন-সঙ্গিনী,—
কোথায় লাগে শাহান-শাহের দৌলৎ ঐ বে-হিসাব!

[৬৪]

দোষ দিও না মদ্যপায়ীর তোমরা, যারা খাও না মদ,
ভালো করার থাকলে কিছু, মদ খাওয়া মোর হ'ত রদ্।
মদ না-পিয়েও, হে নীতিবিদ্, তোমরা যে-সব কর পাপ,
তাহার কাছে আমরাও শিশু, হই না যতই মাতাল-বদ্!

[৬৫]

খুশী-মাখা পেয়ালাতে ঐ গোলাপ-রক্ত মদ—মধুর!
মধুরতর পাখীর গীতি, বেণুর ধ্বনি বীণার সুর।
কিন্তু ঐ যে ধর্মগোঁড়া——বুঝল না যে মদের স্বাদ,
মধুরতম——রয় সে যখন অন্ততঃ পাঁচ যোজন দূর!

[৬৬]

চৈতী-রাতে খুঁজে নিলাম তৃণাস্তৃত ঝর্ণা তীর,
সুন্দরী এক হুরী নিলাম, পেয়ালা নিলাম লাল পানির।
আমার নামে রইল হাজার কুৎসা গ্লানির ঝড় তুফান,
ভুলেও মনে হ'ল না মোর স্বর্গ নরকের নজীর।

[৬৭]

সাকী-হীন ও শরাব-হীনের জীবনে হায় সুখ কী বল?
নাই ইরাকী-বেণুর ধ্বনির জমজমাট সুর-উছল
সুখ নাই ভাই সেথায় থেকে, এই জগতের তত্ত্ব শোন,
আনন্দ-হীন জীবন-বাগে ফলে শুধু তিক্ত ফল।

[৬৮]

মরুর বুকে বসাও মেলা, উপনিবেশ আনন্দের,
একটি হৃদয় খুশী করা তাহার চেয়ে মহৎ ঢের।
প্রেমের শিকল পরিয়ে যদি বাঁধতে পার একটি প্রাণ—
হাজার বন্দী মুক্ত করার চেয়েও অধিক পুণ্য এর।

[৬৯]

শরাব এবং প্রিয়ায় নিয়ে, সাকী, হেথায় এলাম ফের!
তোবা করেও পাইনে রেহাই হাত হতে ভাই এই পাপের।
'নূহ্' আর তাঁর প্লাবন-কথা শুনিয়ো নাকো আর, সাকী,
তার চেয়ে মদ-প্লাবন এনে ডুবাও ব্যথা মোর বুকের!

[৭০]

নৃত্য-পাগল ঝর্ণাতীরে সবুজ ঘাসের ঐ ঝালর
উন্মুখ কার চুমো যেন দেব-কুমারের ঠোঁটের 'পর—
হেলায় পায়ে দলো না কেউ—এই যে সবুজ তৃণের ভিড়
হয়ত কোনো গুল-বদনীর কবর-ঢাকা নীল চাদর।

[৭১]

আমার ক্ষণিক জীবন হেথায় যায় চলে ঐ ত্রস্ত পায়
খরস্রোতা স্রোতস্বতী কিংবা মরু-ঝঞ্ঝা প্রায়।
তারই মাঝে এই দু'দিনের খোঁজ রাখি না—ভাবনা নাই,
যে গত-কাল গত, আর যে আগামী-কাল আসতে চায়।



[৭২]

আর কতদিন সাগর-বেলায় খাম্‌কা বসে তুলব ইঁট!
গড় করি পায়, দিক্‌ লেগেছে গ'ড়ে গ'ড়ে মূর্তি পীঠ।
ভেবো নাকো—খৈয়াম ঐ জাহান্নমের বাসিন্দা,
ভিতরে সে স্বর্গ-চারী, বাহিরে সে নরক-কীট।

[৭৩]

মধুর, গোলাপ-বালার গালে দক্ষিণ হাওয়ার মদির শ্বাস,
মধুর, তোমার রূপের কুহক মাতায় যা এই পুষ্পাবাস।
যে গেছে কাল গেছে চলে এলো না তার ম্লান স্মৃতি,
মধুর আজের কথা বল, ভোগ করে নাও এই বিলাস।

[৭৪]

শীত ঋতু ঐ হ'ল গত বইছে বায় বসন্তের,
জীবন-পুঁথির পাতাগুলি পড়বে ঝ'রে, নাই দেরি।
ঠিক বলেছেন দরবেশ এক, "দূষিত বিষ এই জীবন,
দ্রাক্ষার রস বিনা ইহার প্রতিষেধক নাই, হেরি।"

[৭৫]

'সরো'র মতন সরল-তনু টাট্‌কা-তোলা গোলাপ-তুল,
কুমারীদের সঙ্গে নিয়ে আনন্দে তুই হ' মশগুল!
মৃত্যুর ঝড় উঠবে কখন্, আয়ুর পিরাণ ছিঁড়বে তোর—
পড়ে আছে ধূলায় যেমন ঐ বিদীর্ণ-দল মুকুল!

[৭৬]

পল্লবিত তরু-লতা কতই আছে কানন-ময়,
দেওদার আর থল্‌কমলে, জান কেন মুক্ত কয়?
দেবদারু তরুর শত কর, তবু কিছু চায় না সে,
থল্‌কমলীর দশরসনা তবু সদা নীরব রয়।

[৭৭]

আমার সাথী সাকী জানে মানুষ আমি কোন্ জাতের,
চাবি আছে তার আঁচলে আমার বুকের সুখ দুখের।
যেমনি মেজাজ মিইয়ে আসে গেলাস ভরে দেয় সে মদ,
এক লহমায় বদ্‌লে গিয়ে দূত হয়ে যাই দেব-লোকের।

[৭৮]

আরাম ক'রে ছিলাম শুয়ে নদীর তীরে কাল রাতে,
পার্শ্বে ছিল কুমারী এক, শরাব ছিল পিয়ালাতে;
স্বচ্ছ তাহার দীপ্তি হেরি শুক্তি-বুকে মুক্তাপ্রায়
উঠল হেঁকে প্রাসাদ-রক্ষী, 'ভোর হ'ল কি আধ-রাতে'?

[৭৯]

মন কহে, আজ ফুটল যখন এন্তার ঐ গোলাপ গুল্,
শরিয়তের আজ খেলাফ্ ক'রে বেদম আমি করব ভুল।
গুল্-লালা-রুখ্ কুমারীদের প্রস্ফুটিত যৌবনে
উঠল রেঙে কানন-ভূমি লালা ফুলের কেয়ারী-তুল্!

[৮০]

হায় রে, আজি জীর্ণ আমার কাব্য পুঁথি যৌবনের!
ধূলায় লুটায় ছিন্ন ফুলের পাপড়িগুলি বসন্তের।
কখন্ এসে গেলি উড়ে, রে যৌবনের বিহঙ্গম!
জানতে পেরে কাঁদছি যখন হয়ে গেছে অনেক দের।

[৮১]

আজ আছে তোর হাতের কাছে, আগামী কাল হাতের বার,
কালের কথা হিসাব করে বাড়াসনে তুই দুঃখ আর।
স্বর্গ-ক্ষরা ক্ষণিক জীবন—করিসনে তার অপব্যয়,
বিশ্বাস কি—নিঃশ্বাস-ভর জীবন যে কাল পাবি ধার!



[৮২]

হায় রে হৃদয়, ব্যথায় যে তোর ঝরিছে নিতুই রক্তধার,
অন্ত যে নেই তোর এ ভাগ্য-বিপর্যয়ের, যন্ত্রণার!
মায়ায় ভুলে এই সে কায়ায় আসলি কেন, রে অবোধ,
আখেরে যে ছেড়ে যেতে হবেই এ আশ্রয় আবার!

[৮৩]

অর্থ বিভব যায় উড়ে সব রিক্ত ক'বে মোদের কর,
হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে মোদের মৃত্যুর নিষ্ঠুর নখর;—
মৃত্যু-লোকের চোখ এড়িয়ে ফেরত কেহ আস্‌ল না,
যে সব পথিক গেল সেথায় নিয়ে তাদের খোশখবর!

[৮৪]

পান করে যাই মদিরা তাই, শুনছি প্রাণে বেণুর রব।
শুনছি আমার তনুর তীরে যৌবনেরই মদির স্তব,
তিক্ত স্বাদের তরে সুরার করো না কেউ তিরস্কার,
ত্যক্ত মানব-জীবন সাথে মানায় ভালো তিক্তাসব।

[৮৫]

ব্যথার দারু শরাব পিও, ইহাই জীবন চিরন্তন,
জরায় স্বর্গ-অমৃত এ, যৌবনের এ সুখ-স্বপন।
গোলাপ, শরাব, বন্ধু লাভের মরসুম এই আনন্দের
য'দিন বাঁচ শরাব পিও, সত্যিকারের এই জীবন।

[৮৬]

সুরা দ্রবীভূত চুনী, সোরাহি সে খনি তার,
এই পিয়ালা কায়া যেন, প্রাণ তার এই দ্রাক্ষাসার।
বেলোয়ারির এই পিয়ালা ভরা তরল হাসির রক্তিমা,
কিংবা ওরা ব্যথায়-ক্ষত হিয়ার যেন রক্তাধার।

[৮৭]

সুরার সোরাহি এই মানুষ, আত্মা শরাব তার ভিতর,
দেহ তাহার বাঁশরী আর তেজ যেন সেই বাঁশীর স্বর।
খৈয়াম! তুই জানিস কি এই মাটির মানুষ কোন জিনিস?
খেয়াল-খুশির ফানুস এ ভাই, ভিতরে তার প্রদীপ-কর।

[৮৮]

ব্যর্থ মোদের জীবন ঘেরা কুগ্রহ সব মেঘলা প্রায়,
'জিহ্ন' সম স্রোত বয়ে যায় অশ্রু-সিক্ত চক্ষে হায়!
বুকের কুণ্ডে দুখের দাহ – তারেই আমি নরক কই,
মুহূর্তের যে মনের শান্তি – আমি বলি স্বর্গ তায়।

[৮৯]

মদের নেশার গোলাম আমি সদাই থাকি নুইয়ে শির,
জীবন আমি পণ রাখি ভাই প্রসাদ পেতে তার হাসির।
শরাব-ভরা কুঁজোর টুঁটি জাপটে সাকী হস্তে তার
পাত্রে ঢালে, নিঠুর হাতে নিঙড়ে তাহার লাল রুধির!

[৯০]

পেতে যে চায় সুন্দরীদের ফুল্লকপোল গোলাপ ফুল
কাঁটার সাথে সইতে হবে তায় নিয়তির তীক্ষ্ণ হুল।
নিঠুর করাত চিরুনিরে কেটে কেটে তুলল দাঁত
তাই সে ছুঁয়ে ধন্য হ'ল আমার প্রিয়ার কেশ আকুল

[৯১]

শরাব নিয়ে বসো, ইহাই মহ্‌ম্মুদেরই সুলতনৎ
'দাউদ' নবীর শিরীন স্বর ঐ বেণু বীণার মধুর গৎ।
লুট করে নে আজের মধু পূর্ণ হবে মনস্কাম,
আজকে পেয়ে ভুলে যা তুই অতীত আর ভবিষ্যৎ।



[৯২]

ওগো সাকী! তত্ত্ব কথা চার ও পাঁচের তর্ক থাক,
উত্তর ঐ সমস্যার গো এক হোক কি একশ লাখ,
আমরা মাটির, সত্য ইহাই, বেণু আনো, শোনাও সুর!
আমরা হাওয়া, শরাব আনো! বাকী যা সব চুলোয় যাক।

[৯৩]

এক নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের এই দুনিয়া রে ভাই মদ চালাও!
কাল্‌কে তুমি দেখবে না আর আজ যে জীবন দেখতে পাও
খামখেয়ালীর সৃষ্টি এ ভাই কালের হাতে লুঠের মাল,
তুমিও তোমার আপনাকে এই মদের নামে লুঠিয়ে দাও!

[৯৪]

কায়কোবাদের সিংহাসন আর কায়কাউসের রাজমুকুট,
তুসের রাজ্য একছিটে এই মদের কাছে সব যে ঝুট!
ধর্ম-গোঁড়ার উপাসনার কর্কশ যে প্রভাত-স্তব
তাহার চেয়ে অনেক মধুর প্রেমিক-জনের শ্বাস অফুট।

[৯৫]

এই সে প্রমোদ-ভবন যথায় জলসা ছিল বাহ্‌রামের,
হরিণ সেথায় বিহার করে, আরাম করে ঘুমায় শের!
চির জীবন করল শিকার রাজশিকারী যে বাহ্‌রাম,
মৃত্যু-শিকারীর হাতে সে শিকার হ'ল হায় আখের!

[৯৬]

ঘরে যদি বসিস গিয়ে 'জমহুর' আর 'আরাস্তু'র,
কিংবা রুমের সিংহাসনে কায়সর হ'স শক্তি-শূর—
জামশেদিয়া জামবাটি ঐ নে শুষে রে, সময় নাই,
বাহ্‌রামও তুই হ'স যদি, তোর শেষ ত গোর আঁধারপুর!

[৯৭]

প্রেমের চোখে সুন্দর সেই হোক কালো কি গৌর-বরণ,
পরুক ওড়না রেশমী কিংবা পরুক জীর্ণ দীন বসন।
থাকুক শুয়ে ধূলায় সে কি থাকুক সোনার পালঙ্কে
নরকে সে গেলেও প্রেমিক করবে সেথায় অন্বেষণ।

[৯৮]

খৈয়াম—যে জ্ঞানের তাঁবু করল সেলাই আজীবন,
অগ্নিকুণ্ডে পড়ে সে আজ সইছে দহন অসহন।
তার জীবনের সূত্রগুলি মৃত্যু-কাঁচি কাটলো হায়,
ঘৃণার সাথে বিকায় তারে তাই নিয়তির দালালগণ।

[৯৯]

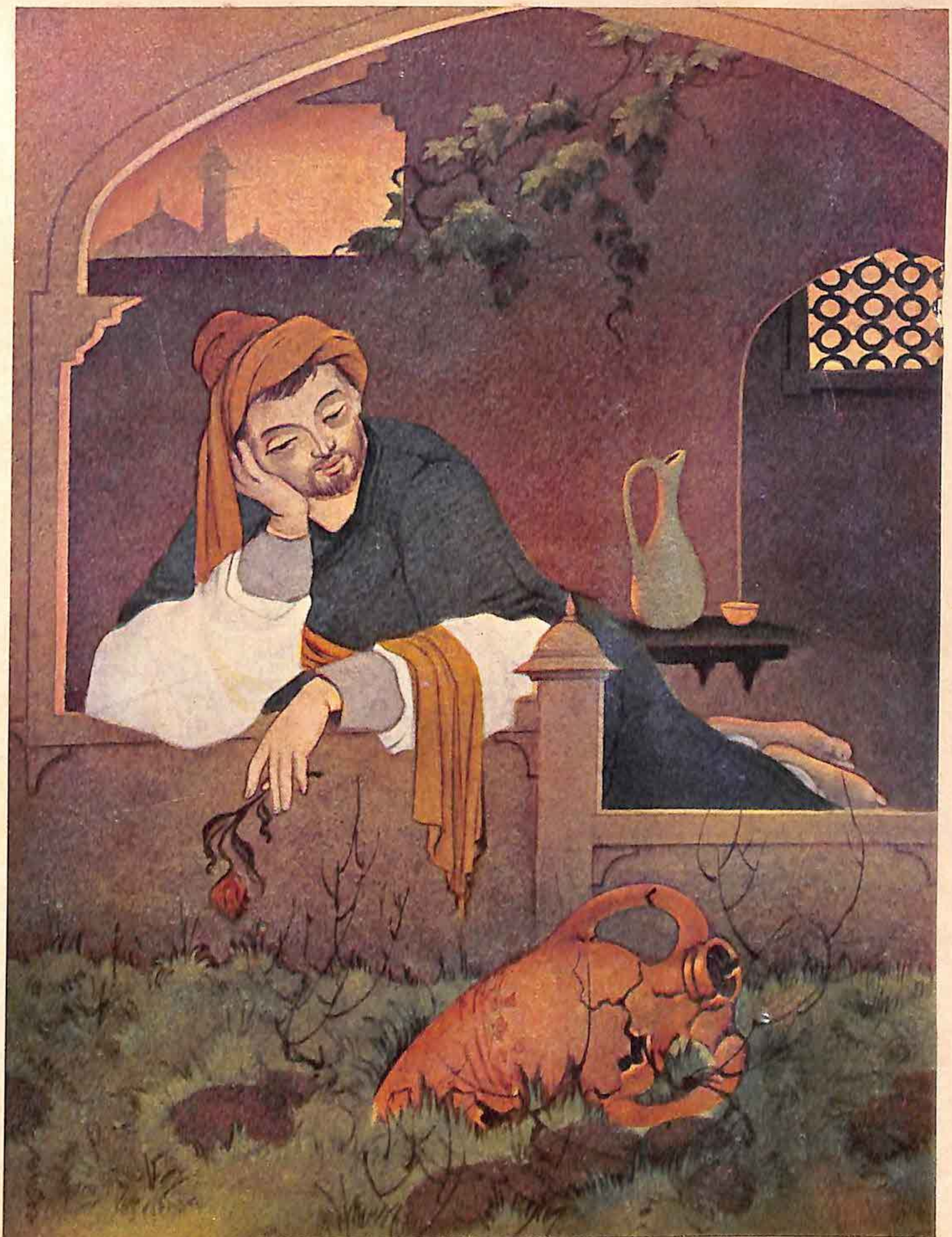
সাত-ভাঁজ ঐ আকাশ এবং চার উপাদান-সৃষ্ট জীবন!
ঐ এগারোর মারপ্যাঁচে সব ধোঁওয়াস্, গলিস বদ-নসীব।
যে যায় সে যায় চিরতরে, ফেরত সে আর আসবে না,
পান করে নে বলব কত, বলে বলে ক্লান্ত জিভ!

[১০০]

খরাব হওযার শরাব-খানায় ছুটছি আমি আবার আজ,
রোজ পাঁচবার আজান শুনি, পড়তে নাহি যাই নামাজ।
যেমনি দেখি উদ্‌গ্রীব ঐ মদের কুঁজো, অমনি ভাই—
কুঁজোর মতই উদ্‌গ্রীব হই, কণ্ঠ সটান হয় দরাজ!

[১০১]

এই কুঁজো—যা আমার মতো ভোগ করেছে প্রেম-দাহন,
সুন্দরীদের মাথায় থাকি পেলো খোঁপার পরশন।
এই সোরাহির পার্শ্বদেশে এই যে হাতল দেখতে পাও,
পেলো কতই তন্বঙ্গীর ক্ষীণ কাঁকালের আলিঙ্গন!



[১০২]

দ্রাক্ষা সাথে ঢলাঢলির এই ত কাঁচা বয়স তোর,
বৎস, শরাব-পাত্র নিয়ে ঠায় বসে দাও আড্ডা জোর!
একবার ত নূহের বন্যা ভাসিয়েছিল জগৎখান,
তুইও না হয় ভাসিয়ে দিলি মদের স্রোতে জীবন তোর!

[১০৩]

সাবধান! তুই বসবি যখন শরাব পানের জলসাতে,
মদ খাস্‌নে বদ্‌-মেজাজী নীচ কুৎসিত লোক সাথে।
রাত্তির ভর করবে সে নীচ চীৎকার আর গণ্ডগোল,
ইতর সম চেঁচিয়ে কারণ দর্শাবে ফের সে প্রাতে।

[১০৪]

যদিও মদ নিষিদ্ধ ভাই, যত পার মদ চালাও,
তিনটি কথা স্মরণে রেখে; কাহার সাথে মদ্য খাও?
মদ-পানের কি যোগ্য তুমি? কি মদই বা করছ পান?—
জ্ঞান পেকে না ঝুনো হ'লে মদ খেয়ো না এক ফোঁটাও!

[১০৫]

তোমরা—যারা পান কর মদ আর সব দিন, কিন্তু যা
পান কর না শুক্রবারে, ছোঁয়ো না শরাবের কুঁজো—
তাদের বলি—আমার মত সব বারকে সমান জ্ঞান,
খোদার তোরা পূজারী হ' করিস নাকো বার পূজো।

[১০৬]

করছে ওরা প্রচার—পাবি স্বর্গে গিয়ে হুর পরী,
আমার স্বর্গ এই মদিরা, হাতের কাছের সুন্দরী।
নগদ্‌ যা পা'স তাই ধরে থাক, ধারের পণ্য করিসনে,
দূরের বাদ্য মধুর শোনায় শূন্য হাওয়ায় সঞ্চারি।

[১০৭]

এই সে আঁধার প্রহেলিকা পারবিনে তুই পড়তে মন!
তুই কি সফল হবি যথায় হার মেনেছে, বিজ্ঞজন?
শরাব এবং পেয়ালা নিয়ে খুশীর স্বর্গ রচ হেথাই
পাবি কি না পাবি বেহেশ্‌ত্‌ বলতে পারে কেউ কখন?

[১০৮]

দোহাই ! ঘৃণায় ফিরিয়ো না মুখ দেখে শরাব-খোর গোঁয়ার,
যদিও সাধু সজ্জনেরই সঙ্গে কাটে কাল তোমার।
শরাব পিও, কারণ শরাব পান কর আর না-ই কর,
ভাগ্যে থাকলে নরক যায় না পাওয়া স্বর্গ আর।

[১০৯]

জীবন যখন কণ্ঠাগত—সমান বলখ্ নিশাপুর,
পেয়ালা যখন পূর্ণ হ'ল—তিক্ত হোক কি হোক মধুর।
ফূর্তি চালাও, নিভে যাবে হাজার তপন লক্ষ চাঁদ,
আমরা ফিরে আসব না আর এই ধরণীর পথ সুদূর!

[১১০]

আয় ব্যয় তোর পরীক্ষা কর্ ঠিক সে হিসাব করতে পেশ,
আসার বেলায় আন্‌লি কি আর নিয়েই বা কি যাস সে দেশ।
"আন্‌ব নাকো বিপদ ডেকে শরাব পিয়ে" ক'স যে তুই,
মদ খাও আর না খাও তবু মরতে তোমায় হবেই শেষ!

[১১১]

হঠাৎ সেদিন দেখলাম, এক কর্মরত কুম্ভকার
করছে চূর্ণ মাটির ঢেলা, ঘট তৈরীর মাল দেদার।
দিব্য দৃষ্টি দিয়ে এসব যেই দেখলাম, কইল মন,
নূতন ঘট এ করছে সৃজন মাটিতে মোর বাপ দাদার।



[১১২]

এ কি আজব করছ সৃষ্টি, কুম্ভকার হে, হাত থামাও!
চূর্ণ নরের মাটি নিয়ে করছ কি তা দেখতে পাও?
কায়খসরুর হৃদয় এবং ফরীদুনের অঙ্গুলি
বে-পরোয়া হয়ে তোমার নিঠুর চাকায় মিশিয়ে যাও!

[১১৩]

চূর্ণ করে তোমায় আমায় গড়বে কুঁজো কুম্ভকার,
ওগো প্রিয়া! পার হবার সে আগেই মৃত্যু-খিড়কি দ্বার—
পাত্রে ব্যথার শান্তি ঢালো—এই সেরাহির লাল সুরা,
এক পেয়ালা তুমি পিও, আমায় দিও পেয়ালা আর।

[১১৪]

এই যে রঙীন পেয়ালাগুলি নিজ হাতে যে গড়ল সে
ফেলবে ভেঙে খেয়াল-খুশির লীলায় এদের বিন-দোষে?
এতগুলি সুষ্ঠু শোভন চটুল আঁখি চন্দ্রমুখ
প্রীতির ভরে সৃষ্টি করে করবে ধ্বংস ক্রোধবশে?

[১১৫]

পিয়ালাগুলি তুলে ধরো চৈত্রী লালা ফুলের প্রায়
ফুরসুত তোর থাকলে, নিয়ে বস লালা-রুখ্‌দিল্‌ প্রিয়ায়।
মউজ ক'রে শরাব পিও, গ্রহের ফেরে হয়ত ভাই
উলটে দেবে পেয়ালা সুখের হঠাৎ-আসা ঝঞ্ঝাবায়।

[১১৬]

মস্‌জিদ আর নামাজ রোজার থামাও থামাও গুণ গাওয়া,
যাও, গিয়ে খুব শরাব পিও, যেমন করেই যাক পাওয়া!
খৈয়াম, তুই পান ক'রে যা, তোর ধূলিতে কোন্‌ একদিন
তৈরি হবে পিয়ালা কুঁজো, গাগ্‌রী, গেলাস মদ খাওয়া!

[১১৭]

মৃত্যু যেদিন নিঠুর পায়ে দল্‌বে আমার এই পরাণ,
আয়ুর পালক ছিন্ন করি' করবে হৃদয়-রক্ত পান
আমায় মাটির ছাঁচে ঢেলে পেয়ালা ক'রে ঢালবে মদ,
হয়ত গন্ধে সেই শরাবের আবার হব আয়ুষ্মান!

[১১৮]

রে নির্বোধ! এ ছাঁচে-ঢালা মাটির ধরা শূন্য সব,
রং-বেরং-এর খিলান করা এই যে আকাশ—অবাস্তব।
এই যে মোদের আসা-যাওয়া জীবন-মৃত্যু-পথ দিয়ে,
একটি নিশ্বাস ইহার আয়ু, আকাশ-কুসুমের এ টব।

[১১৯]

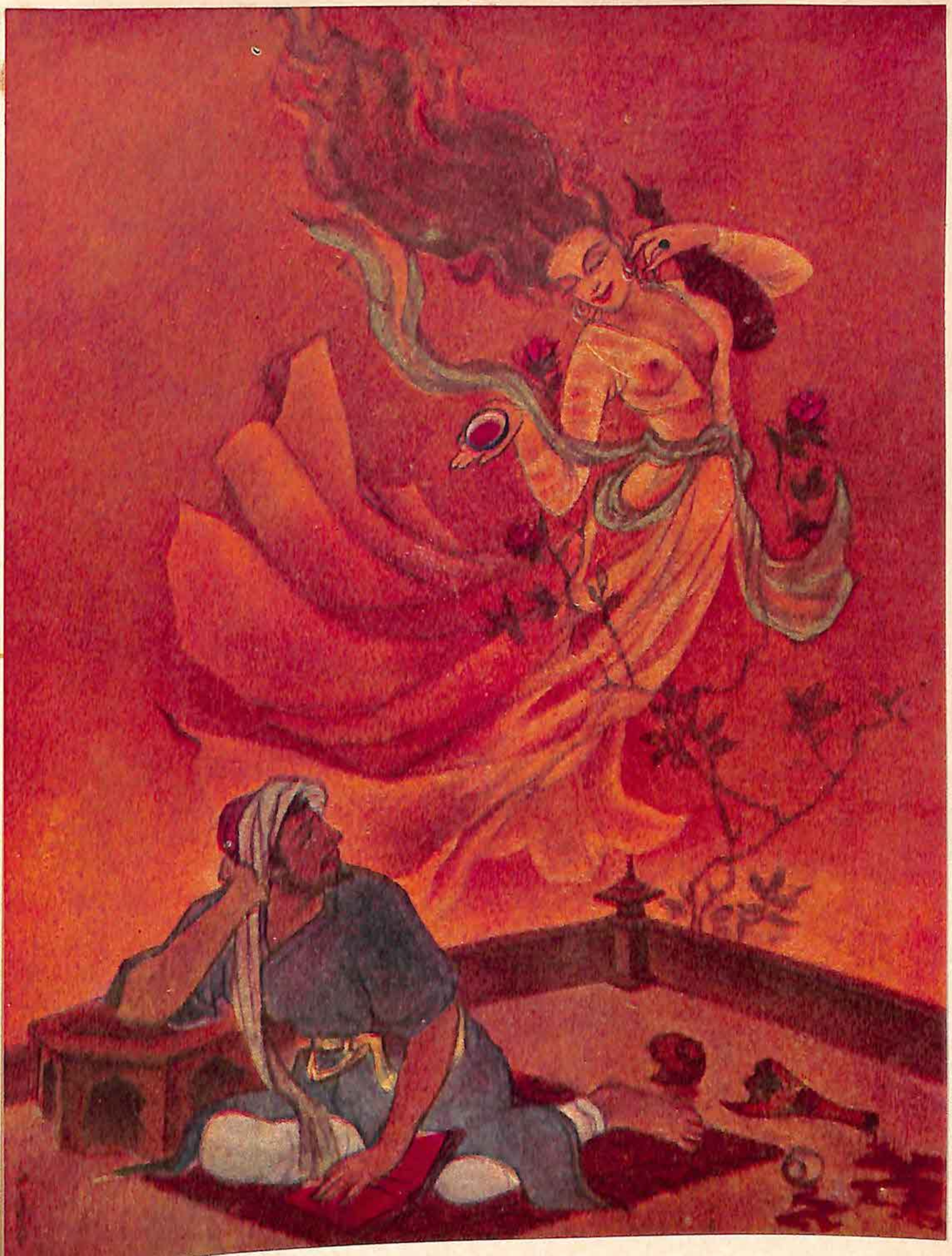
তিরস্কার আর করবে কত জ্ঞান-দাম্ভিক অর্বাচীন?
লম্পট নই, পান যদিও করি শরাব রাত্রিদিন!
তোমার কাছে তস্‌বী দাড়ি, তাপস সাজার নানান মাল,
আমার পুঁজি দিল্‌-প্রিয়া আর লাল পেয়ালি মদ-রঙীন!

[১২০]

মসজিদের ঐ পথে ছুটি প্রায়ই আমি ব্যাকুল প্রাণ,
নামাজ পড়তে নয় তা বলে, খোদার কসম! সত্যি মান
নামাজ পড়ার ভান ক'রে যাই করতে চুরি জায়নামাজ,
যেই ছিঁড়ে যায় সেখানা, যাই করতে চুরি আরেকখান।

[১২১]

নিত্য দিনে শপথ করি—করব তৌবা আজ রাতে,
যাব না আর পানশালাতে, ছোঁব না আর মদ হাতে।
অমনি আঁখির আগে দাঁড়ায়ে গোলাপ-ব্যাকুল বসন্ত
সকল শপথ ভুল হয়ে যায়, কুলোয় না আর তৌবাতে।



[১২২]

আগে যে সব সুখ ছিল, আজ শুনি তাদের নাম কেবল,
মদ ছাড়া সব গেছে ছেড়ে আগের ইয়ার বন্ধুদল।
কেমন ক'রে ছাড়ব—যে মদ আমায় কভু ছাড়ল না,
এক পেয়ালা আনন্দ, তাও ছাড়লে কিসে বাঁচব বল্!

[১২৩]

আমরা শরাব পান করি তাই শ্রীবৃদ্ধি ঐ পানশালার,
এই পাপীদের পিঠ আছে তাই স্থান হয়েছে পাপ রাখার।
আমরা যদি পাপ না করি ব্যর্থ হবে তাঁর দয়া,
পাপ করি তাই ক্ষমা করে করুণাময় নাম খোদার!

[১২৪]

তোমার দয়ার পিয়ালা প্রভু উপচে পড়ুক আমার 'পর
নিত্য ক্ষুধার অন্ন পেতে না যেন হয় পাততে কর।
তোমার মদে মস্ত কর আমার 'আমি'র পাই সীমা
দুঃখে যেন শির না দুখায়, হে দুখ-হর, অতঃপর।

[১২৫]

আমায় সৃজন করার দিনে জানত খোদা বেশ করেই,
ভাবীকালের কর্ম আমার, বলতে পারত মুহূর্তেই।
আমি যে সব পাপ করি—তা ললাট-লেখা, তাঁর নিদেশ,
সেই সে পাপের শাস্তি নরক—কে বলবে ন্যায় বিচার এই!

[১২৬]

দুঃখে আমি মগ্ন প্রভু, দুয়ার খোলো করুণার!
আমায় কর তোমার জ্যোতিঃ, অন্তর মোর অন্ধকার।
স্বর্গ যদি অর্জিতে হয় এতই পরিশ্রম ক'রে—
সে ত আমার পারিশ্রমিক নয় সে দয়ার দান তোমার।

[১২৭]

দয়ার তরেই দয়া যদি, করুণাময় স্রষ্টা হন,
আদমেরে স্বর্গ হ'তে দিলেন কেন নির্বাসন?
পাপীর তরে করুণা যে—করুণা সে-ই সত্যিকার,
তারে আবার প্রসাদ কে কয় পুণ্য করে যা অর্জন!

[১২৮]

আড্ডা আমার এই সে গুহা, মদ চোলাই-এর এই দোকান,
বাঁধা রেখে আত্মা-হৃদয় করি হেথায় শরাব পান।
আরাম-সুখের কাঙাল নহি, ভয় করি না দুর্দশায়,
এই ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুতের ঊর্ধ্বে ফিরি মুক্ত-প্রাণ।

[১২৯]

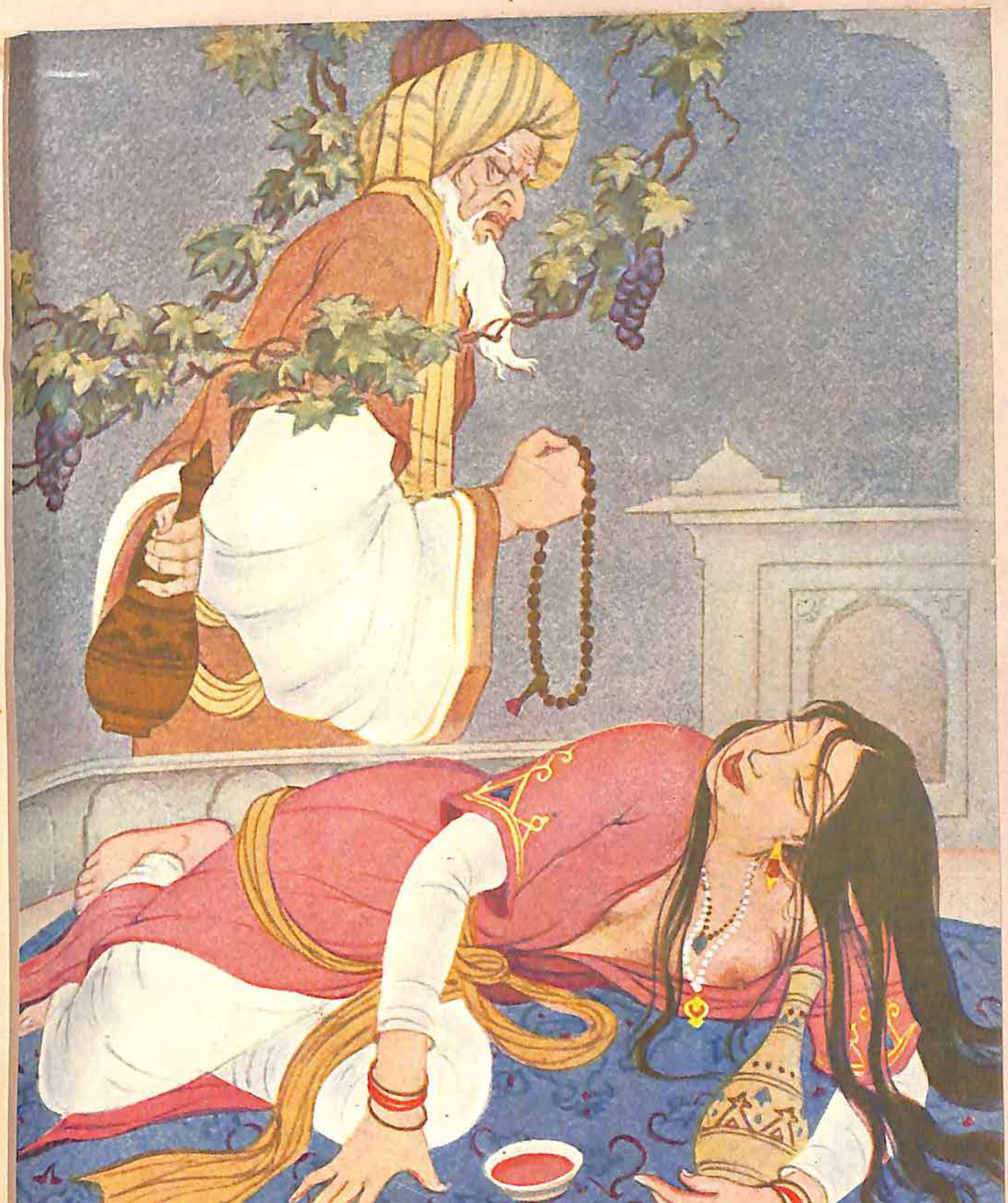
দেখে দেখে ভণ্ডামী সব হৃদয় বড় ক্লান্ত ভাই,
তুরন্ত্ শরাব আনো সাকী, ভণ্ডের মুখ ভুল্‌তে চাই!
শরাব আনো বাঁধা রেখে এই টুপি এই জায়নামাজ,
হব বক-ধার্মিক কা'ল, আজ ত এখন মদ চালাই।

[১৩০]

স্যাঙাৎ ওগো, আজ যে হঠাৎ মোল্লা হয়ে সাজলে সং!
ছাড় কপট তপের এ ভান, সাধুর মুখোস্ এই ভড়ং।
দেবেন 'আলী মুর্ত্তজা' যা সাকী হয়ে বেহেশ্‌তে
পান কর সে শরাব হেথাও হুরী নিয়ে রং-বেরং।

[১৩১]

পানোন্মত্ত বারাঙ্গনায় দেখে সে এক শেখজী কন—
"দুরাচার আর সুরার কর দাসীপনা সর্বক্ষণ!"
"আমায় দেখে যা মনে হয়, তাই আমি" কয় বারনারী,
"কিন্তু শেখজী, তুমি কি তাই, তোমায় দেখে কয় যা মন?"



[১৩২]

হাতে নিয়ে পান-পিয়ালা নামাজ পড়ার মাদুরখান—
দেখতে পেলাম ভাঁটি-খানার পথ ধরে শেখ সাহেব যান!
কইনু দেখে, "ব্যাপার কি এ, এ-পথে যে শেখ সাহেব!"
কইলেন পীর, "ফক্কিকার এ-দুনিয়া, কর শরাব পান!"

[১৩৩]

কালকে রাতে ফিরছি যখন ভাঁটি-খানার পাঁড় মাতাল,
পীর সাহেবে দেখতে পেলাম, হাতে বোতল-ভরা মাল।
কইনু, "হে পীর, শরম তোমার নেই কি?" হেসে কইল পীর,
"খোদার দয়ার ভান্ডার সে অফুরন্ত, রে বাচাল!"

[১৩৪]

হে শহরের মুফ্‌তি! তুমি বিপথ-গামী কম ত নও,
পানোন্মত্ত আমার চেয়ে তুমিই বেশী বেহুঁশ হও।
মানব-রক্ত শোষ তুমি, আমি শুষি আঙুর-খুন,
রক্ত-পিপাসু কে বেশী এই দু-জনের, তুমিই কও!

[১৩৫]

ভণ্ড যত ভড়ং ক'রে দেখিয়ে বেড়ায় জায়নামাজ,
চায় না খোদায়—লোকের তারা প্রশংসা চায় ধাপ্পাবাজ!
দিব্যি আছে মুখোস প'রে সাধু ফকির ধার্মিকের,
ভিতরে সব কাফের ওরা, বাইরে মুসলমানের সাজ!

[১৩৬]

ধূলি-ম্লান এ উপত্যকায় এলি, এসেই হলি গুম্,
করল তোরে জরদ্‌গব এই সে যাওয়া আসার ধুম।
নখগুলো তোর পুরু হয়ে হয়েছে আজ ঘোড়ার খুর,
দাড়ির বোঝা জড়িয়ে গিয়ে হ'ল যেন গাধার দুম্।

[১৩৭]

সুন্দরীদের তনুর তীর্থে এই যে ভ্রমণ, শরাব পান
ভণ্ডদের ঐ বুজ্‌রুকি কি হয় কখনো তার সমান?
প্রেমিক এবং পান-পিয়াসী এরাই যদি যায় নরক,
স্বর্গ হবে মোল্লা পাদরী আচার্যদের "দাড়ী-স্থান"!

[১৩৮]

এই মূঢ়দল—স্থূল তাহাদের অজ্ঞানতার ঘোর মায়ায়,
ভাবে — মানবজাতির নেতা তারাই জ্ঞান ও গরিমায়।
ফতোয়া দিয়ে কাফের করে তাদের তারা এক কথায়
শুভ্র-মুক্ত বুদ্ধি যারা, নয় গর্দভ তাদের ন্যায়।

[১৩৯]

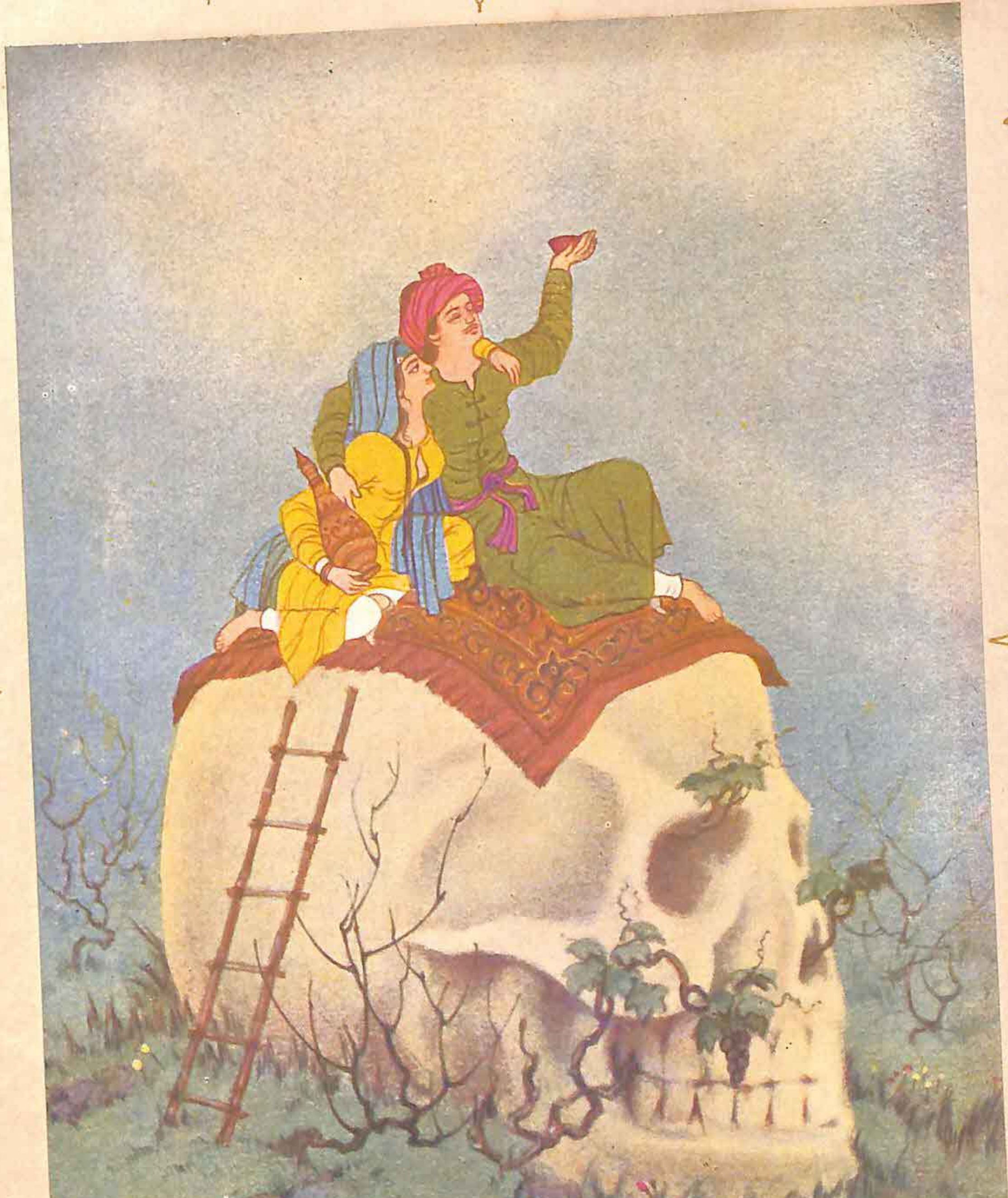
মার্কা-মারা রইস্ যত—ঈষৎ দুখের বোঝার ভার
বইতে যাঁরা পড়েন ভেঙে, বিস্ময়ের নাই অন্ত আর,
তাঁরাই যখন দীন দরিদ্রে দেখেন দ্বারে পাততে হাত
তাদের তখন চিন্‌তে নারেন মানুষ ব'লে এই ধরার।

[১৪০]

দরিদ্রেরে যদি তুমি প্রাপ্য তাহার অংশ দাও,
প্রাণে কারুর না দাও ব্যথা, মন্দ কারুর নাহি চাও
তখন তুমি শাস্ত্র মেনে না-ই চললে তায় বা কি!
আমি তোমায় স্বর্গ দিব, আপাততঃ শরাব নাও!

[১৪১]

জ্ঞান যদি তোর থাকে কিছু—জ্ঞানহারা হ' সত্যিকার,
পান করে নে শাশ্বতী সে সাকীর পাত্রে সুরার সার!
শেয়ান-জ্ঞানী! তোর তরে নয় গভীর আত্মবিস্মৃতি,
সব বোকারা জ্ঞান লভে না সত্যিকারের জ্ঞানহারার।



[১৪২]

যার পরে তোর আস্থা গভীর, এই যে বুকের বন্ধু তোর
মার্জিত জ্ঞান-চক্ষু নিয়ে দেখ এই তোর শত্রু ঘোর।
বন্ধু বেছে নিসনে রে তোর অমার্জিতের ভিড় থেকে,
ভেজিয়ে দে ভাই অন্তর-হীন অন্তরঙ্গতার এ দোর।

[১৪৩]

দাস হয়ো না মাৎসর্যের, হয়ো নাকো অর্থ-বশ,
ঘাড়ে যেন ভর করে না ঠুনকো যশোখ্যাতির সখ,
অগ্নিসম প্রদীপ্ত হও, বন্যা সম প্রাণোদ্বেল,
হয়ো নাকো পথের ধূলি, হাওয়ার হাতের ক্রীড়নক!

[১৪৪]

যোগ্য হাতে জ্ঞানীর কাছে ন্যস্ত কর এই জীবন,
নির্বোধদের কাছ থেকে ভাই থাকবে তফাত দশ যোজন!
জ্ঞানী হাকিম বিষ যদি দেয় বরং তাহাই করবে পান,
সুধাও যদি দেয় আনাড়ি—করবে তাহা বিসর্জন!

[১৪৫]

সেরেফ খেয়াল-খুশির বশে আপন জনের বক্ষে তুই,
এই যে তীব্র যন্ত্রণারই ক্ষত এ'কে দিস নিতুই—
শোক কর, কাঁদ, অশান্ত তোর মনও মৃত বী'র তরে,
আপন হাতে বধ করেছিস, রে অবোধ, এ শক্তি দুই।

[১৪৬]

ধীর চিত্তে সহ্য কর, দুঃখ শোকের এই দাওয়াই,
দুঃখ পেয়ে রুক্ষ-মেজাজ হসনে, দেখবি দুঃখ নাই!
অভাবে ক্ষয় হয় না যেন তোর স্বভাবের প্রশান্তি,
ষড়ৈশ্বর্য লাভের উপায়, আমার মতে, এই সে ভাই।

[১৪৭]

আকাশ পানে হতাশ আঁখি চেয়ে থাকি নির্নিমিখ্
'লওহ' 'কলম' বেহেশ্‌ত্‌-দোজখ কোথায় থাকে কোন্ সেদিক
অন্ধকারে পেলাম আলো, দরবেশ এক কইল শেষ—
'লওহ' 'কলম' বেহেশ্‌ত্‌-দোজখ তোরি মাঝে—নয় অলীক।

[১৪৮]

দশ বিদ্যা, আট স্বর্গ, সাত গ্রহ আর নয় গগন
করল স্রষ্টা সৃষ্টি রে ভাই, দেখছে যাহা জ্ঞান-নয়ন।
চার উপাদান, ইন্দ্রিয় পাঁচ, আত্মা তিন, ও দুই জগৎ—
পারল না সে সৃষ্টি করতে আরেকটি লোক মোর মতন!

[১৪৯]

কি নই আর কি নই আমি—মোর চেয়ে তা কে জানে?
ঊর্ধ্বে নিম্নে যাহা কিছু ভেদ আছে তার মোর প্রাণে।
একদিনে মোর এসব বিদ্যা করব জলে বিসর্জন,
শরাব পানের অধিক মহৎ—কেউ যদি তার খোঁজ আনে।

[১৫০]

শূন্য হাতড়ে শূন্য পেলাম—যে আঁধারকে সে আঁধার!
একদা মোর ছিল যখন যৌবনেরই অহঙ্কার
ভেবেছিলাম—গিঁঠ খুলেছি জীবনের সব সমস্যার।
আজকে হয়ে বৃদ্ধ জ্ঞানী বুঝেছি ঢের বিলম্বে,

[১৫১]

আসিনি ত হেথায় আমি আপন স্বাধীন ইচ্ছাতে,
যাবও না নিজ ইচ্ছামত, খেলার পুতুল তাঁর হাতে!
ক্ষীণ কাঁকালে জড়িয়ে আঁচল, ঢালো সাকী বিলাও মদ।
পিয়ালা ভর সেই পানিতে—ধরার কালি ধোয় যাতে।



[১৫২]

ঘেরা-টোপের পর্দা-ঘেরা দৃষ্টি-সীমা মোদের ভাই,
বাইরে ইহার দেখতে গেলে শূন্য শুধু দেখতে পাই।
এই পৃথিবীর আঁধার বুকে মোদের সবার শেষ আবাস—
বলতে গেলে ফুরোয় না আর বিষাদ-করুণ সেই কথাই।

[১৫৩]

আমার রোগের এলাজ্ কর পিইয়ে দাওয়াই লাল সুরা,
পাংশুমুখে ফুটবে আমার চুনীর লালী, বন্ধুরা!
মরব যেদিন—লাল পানিতে ধুয়ো সেদিন লাশ আমার,
আঙুর-কাঠের 'তাবুত্' ক'রো, কবর দ্রাক্ষাদল-ঝুরা।

[১৫৪]

পেয়ালার প্রেম যাচ্ঞা কর, থেমো না এক মুহূর্তও,
থাকবে হৃদয় মগজ তাজা মদ দিয়ে তায় ভিজিয়ে থোও!
আদমেরে করতে প্রণাম শয়তান দু হাজার বার—
হায় যদি সে গিলতে পেত বিন্দু-প্রমাণ আঙুর-মউ!

[১৫৫]

অঙ্গে রক্ত মাংসের এই পোষাক আছে যতক্ষণ
তক্‌দীরের ঐ সীমার বাইরে করিসনে তুই পদার্পণ।
নোয়াসনে শির, 'রুস্তম' 'জাল' শত্রু যদি হয় রে তোর,
দোস্ত্ যদি হয় 'হাতেম-তাই' তাহারও দান নিস্‌নে শোন্!

[১৫৬]

কইল গোলাপ, "মুখে আমার 'ইয়াকুত্' মণি, রং সোনার,
গুল্‌বাগিচার মিসর দেশে য়ুসোফ আমি রূপকুমার।"
কইনু, "প্রমাণ আর কিছু কি দিতে পার?" কইল সে,
"রক্ত-মাখা এই যে পিরাণ প'রে আছি, প্রমাণ তার!"

[১৫৭]

হৃদয় ছিল পূর্ণ প্রেমে, পেয়েছিলাম তার একাও,
বক্ষে ছিল কথার সাগর, এ কটি কথা কইনি তাও।
দাঁড়িয়ে ভরা নদীর তীরে মরলাম আমি তৃষ্ণাতুর,
বিস্ময়কর এমন শহীদ দেখেছ আর কেউ কোথাও?

[১৫৮]

'ইয়াসিন' আর 'বরাত' নিয়ে, সাকী রে, রাখ, তর্ক তোর!
আমার সুরার হাত-চিঠে দাও, সেই সে 'সুরা বরাত' মোর।
যে রাতে মোর শ্রান্তি ব্যথা ডুবিয়ে দেবে মদের স্রোত,—
সেই সে 'শবে-বরাত' আমার, সেই ত আমার বরাত জোর।

[১৫৯]

ভূ-লোক আর দ্যুলোকেরই মন্দ ভালোর ভাবনাতে,
বে-পরোয়া ঘুরে বেড়াই ভাটি-খানার আড্ডাতে।
গোলক হয়ে পড়ত যদি মোর ঘরে ঐ যুগল লোক,
মদের নেশায় বিকিয়ে দিতাম ওদের একটা আধলাতে।

[১৬০]

এই নেহারি—নিবিড় মেঘে মগ্ন আছে মুখ তোমার,
একটু পরেই ঠিকরে পড়ে ভুবন-মোহন দীপ্তি তার।
মহলা দাও নিজ মহিমার নিজের কাছেই, হে বিরাট্,
দ্রষ্টা তুমি, দৃশ্য তুমি তোমার অভিনয়-লীলার!

[১৬১]

আমরা দাবা খেলার ঘুঁটি, নাইরে এতে সন্দ নাই!
আসমানী সেই রাজ-দাবাড়ে চালায় যেমন চলছি তাই।
এই জীবনের দাবার ছকে সামনে পিছে ছুটছি সব,
খেলার শেষে তুলে মোদের রাখবে মৃত্যু-বাক্সে ভাই!



[১৬২]

আসমানি হাত হতে যেমন পড়বে ঘুঁটি ভাগ্যে তোর।
পণ্ডশ্রম করিসনে তুই হাতড়ে ফিরে সকল দোর
এই জীবনের জুয়াখেলায় হবেই হবে খেলতে ভাই
সৌভাগ্যের সাথে বরণ করে নে দুর্ভাগ্য তোর।

[১৬৩]

চাল ভুলিয়ে দেয় রানী মোর খঞ্জন ঐ চোখ খর,
বোড়ে দিয়ে বন্দী ক'রে আমার ঘোড়া গজ হর!
তোমার সকল বল আগিয়ে কিস্তির পর কিস্তি দাও,
শেষে লালা-রুখ্ দেখিয়ে 'রুখ্' নিয়ে মোর, মাত্ কর!

[১৬৪]

আস্মানে এক বলীবর্দ রয় 'পর্বিণ' নাম তাহার,
আছে আরেক বৃষভ নিচে বইতে মোদের ধরার ভার।
কাজেই, এই যে মানবজাতি—জ্ঞানীর চক্ষে হয় মালুম—
ঐ সে ভীষণ ষাঁড় যুগলের মধ্যে যেন ঝাঁক গাধার!

[১৬৫]

শ্রেষ্ঠ শরাব পান ক'রে নেয় বদ্‌রসিকে, হায় রে হায়!
স্থূল-আত্মা মূর্খ ধনিক শ্রেষ্ঠ বিলাস বিভব পায়।
হায় রে যত চিত্তহারী রূপকুমারী জর্জিয়ার
শূকায় কিনা গুম্ফ-বিহীন বালক-সাথে মাদ্রাসায়।

[১৬৬]

রূপ লোপ এর হয় অরূপে, অস্তি ইহার হয় না নাশ।
এই মদিরা—হাজার রূপে অরূপে এর হয় প্রকাশ,
ভেবো না কেউ—সুরার সাথে সুরার সারও যায় উবে,
কভু এ হয় প্রাণী কভু তরু-লতা, ফুল-সুবাস।

[১৬৭]

লাল গোলাপে কিস্তি দিয়ে তোমার ও গাল করে মাত,
খেল্‌তে গিয়ে চীন কুমারী হারে প্রিয়া, তোমার সাথ।
খেলতে বাবিল্‌-রাজার সাথে হানলে চাউনি একটিবার
মন্ত্রী ঘোড়া গজ নিলে তার হেনে ঐ এক নয়ন-পাত!

[১৬৮]

তোমার-আমার কি হবে ভাই তাই ভেবে মোর ব্যাকুল মন!"
মীন-কুমারী হংসীরে কয়, "শুকাবে এই বিল যখন
মরালী কয়, "কাবাব যদি হই দুজনাই তুই-আমি,
ভাসলে এ বিল মদের স্রোতে মোদের কি তায় লাভ তখন!"

[১৬৯]

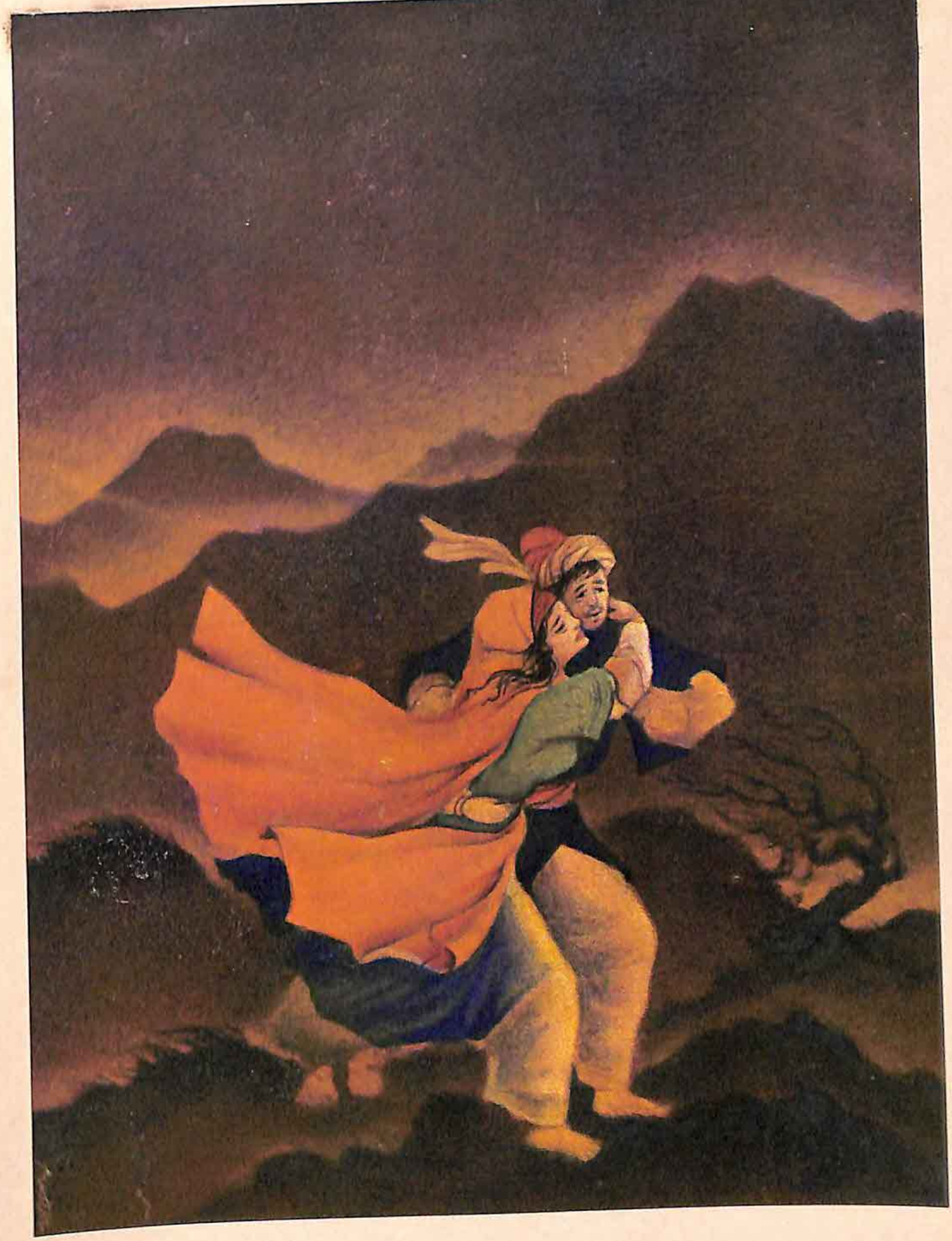
ঘূর্ণমান ঐ কুগ্রহ-দল—সদাই যারা ভয় দেখায়—
ঘুরছে ওরা ভোজবাজির ঐ লণ্ঠনেরই ছায়ার প্রায়।
সূর্য যেন মোমবাতি আর ছায়া যেন পৃথ্বী এই,
কাঁপছি মোরা মানুষ যেন প্রতিকৃতি আঁকা তায়।

[১৭০]

ফিরনু পথিক সাগর মরু ঘোর বনে পর্বত-শিরে
এই পৃথিবীর সকল দেশে গুহায় ঘরে মন্দিরে,
শুনলাম না—ফিরছে কেউ তীর্থ-পথিক এই পথের,
আজ এ পথে যাত্রা যাহার, আসল না সে কা'ল ফিরে!

[১৭১]

দুইজনাতেই সইছি সাকী নিয়তির ভ্রূভঙ্গ ঢের,
এই ধরাতে তোমার আমার নাই অবসর আনন্দের।
তবুও মোদের মাঝে আছে মদ-পিয়ালা যতক্ষণ
সেই ত ধ্রুব সত্য, সখি, পথ দেখাবে সেই মোদের!



[১৭২]

স্রষ্টা মোরে করল সৃজন জাহান্নমে জ্বলতে সে,
কিংবা স্বর্গে করবে চালান—তাই বা পারে বলতে কে!
করব না ত্যাগ সেই লোভে এই শরাব সাকী দিল্‌রুবা,
নগদ্‌ দার এ ব্যবসা খুইয়ে ধারে স্বর্গ কিন্‌বে কে?

[১৭৩]

দুর্ভাগ্যের বিরক্তি পান করতে যেন না হয় আর,
পানই যদি করি, পানি পান করব পান-শালার।
এই সংসার হত্যাকারী, রক্ত তাহার লাল শরাব,
আমাদের যে খুন করে, কি? করব না পান খুন তাহার?

[১৭৪]

ওমর রে, তোর জ্বলছে হৃদয় হয়ত নরকেই জ্বলি,
তাহার বহ্নি-মহোৎসবে হয়ত হবি অঞ্জলি।
খোদায় দয়া শিখাতে ধাস সেই সে তুই, কি দুঃসাহস।
তুই শিখাবার কে, তাঁহারে শিখাতে যাস কি বলি?

[১৭৫]

কুগ্রহ মোর! বলতে পারিস্, করেছি তোর ক্ষতি কোন্
সত্যি বলিস, মোর পরে তুই বিরূপ এত কি কারণ!
একটু মদের তরে এত উঞ্ছবৃত্তি তোষামোদ
এক টুকরো রুটির তরে, ভিক্ষা করাস অনুক্ষণ।

[১৭৬]

জল্লাদিনী ভাগ্যলক্ষ্মী, ওর্ফে ওগো গ্রহের ফের!
স্বভাব-দোষে চিরটা কাল নিষ্ঠুরতার টানছ জের।
বক্ষ তোমার বিদারিয়া দেখ্‌তে যদি এই ধরা
খুঁজে পেতো ঐ বুকে তার হারা-মণি-মাণিক ঢের।

[১৭৭]

ভাগ্য দেবী! তোমার যত লীলা খেলায় সুপ্রকাশ
অত্যাচারী উৎপীড়কের দাসী তুমি বারো মাস।
মন্দকে দাও লাখ নিয়ামত ভালোকে দাও দুঃখ শোক,
বাহাত্তুরে ধরলো শেষে? না এ বুদ্ধিভ্রম বিলাস?

[১৭৮]

সইতে জ্‌ল্‌ম খল নিয়তির চাও বা না চাও শির নোওয়াও!
বাঁচতে হলে হাত হতে তার প্রচুর ভাবে মদ্য খাও।
তোমার আদি অন্ত উভয় এই সে ধ্‌লো মাটির কোল,
নিম্নে নয় আর, এখন তুমি ধরার ধ্‌লির ঊর্ধ্বে ধাও।

[১৭৯]

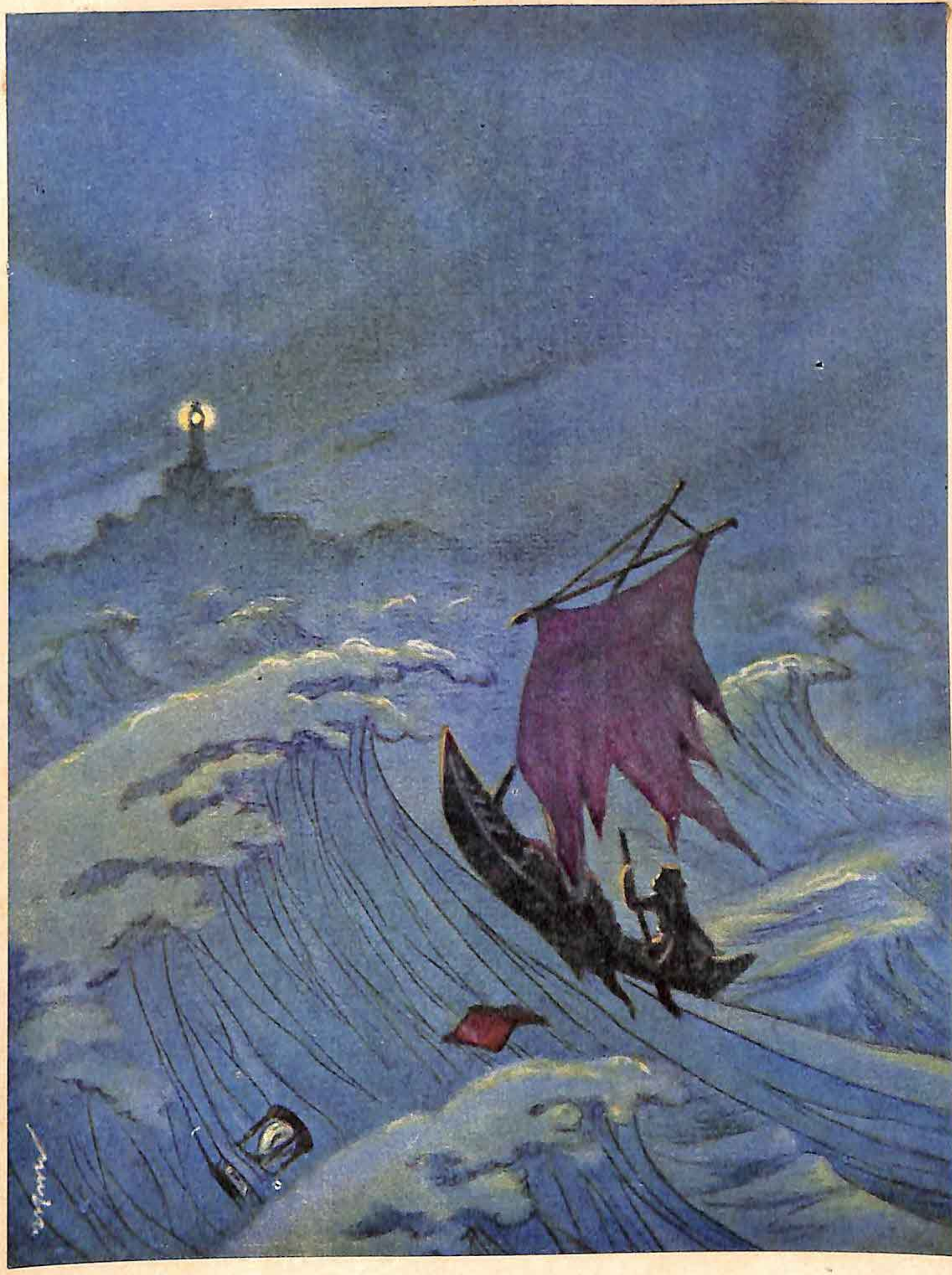
মোক্ষম বাঁধ বেঁধেছে যে মোদের স্বভাব-শৃঙ্খলে,
স্বভাব-জয়ী হতে আবার আমাদেরে সেই বলে!
দাঁড়িয়ে আছি ব্‌দ্ধি-হত তাই এ দ্‌য়ের মাঝখানে—
উলটে ধরবে কুঁজো কিন্তু জল যেন তার না টলে!

[১৮০]

মান্‌ষ খেলার গোলক প্রায় ফিরছে ছ্‌টে ডাইনে বাঁয়,
যেদিক পানে চলতে বলে ক্র্‌র নিয়তির হাতা তায়।
কেন হলি ভাগ্যদেবীর নিঠুর খেলার প্‌তুল তুই,
সে-ই জানে—এক সে-ই জানে রে, আমরা প্‌তুল অসহায়!

[১৮১]

খাম্‌কা ব্যথার বিষ খাসনে, মুষড়ে যাসনে নিরাশায়,
ফেরেব-বাজির এই দুনিয়ায় তুই ধরে থাক সত্য ন্যায়
আখেরে ত দেখলি বিশ্ব শূন্য ফাঁস ফক্কিকার,
তুইও মায়ার পুতুল যখন—ভয় ভাবনা যাক চুলায়!



[১৮২]

সিন্ধু হতে বিচ্ছেদেরই দুঃখে কাঁদে বিন্দুজল,
'পূর্ণ আমি', কইল হেসে বিন্দুরে সিন্ধু অতল।
সত্য শুধু পূর্ণ, বাকী অন্য যা তা নাস্তি সব,
ঘূর্ণমান ঐ এক সে বিন্দু বহুর রূপে করছে ছল।

[১৮৩]

আমার রানী (দীর্ঘায়ু হন দগ্ধে মারতে দাসকে তাঁর!)
হঠাৎ খেয়াল হ'ল, দিলেন সস্নেহ এক উপহার!
গেলেন চলে অনুগ্রহের চাউনি হেনে! তার মানে—
'তার চেয়ে ঐ নালার জলে দাও ভাসিয়ে প্রেম তোমার!'

[১৮৪]

তোমার আদরিণী বধূ ছিল, প্রভু আত্মা মোর,
কাছ হ'তে তায় তাড়িয়ে দিলে কোন দোষে হায়, হে মনোচোর!
পূর্বে কভু ছিলে না ত এমন কঠোর, হে স্বামী!
বিরহিণী বাস করিব প্রবাসে কি জীবন ভর?

[১৮৫]

যেমনি পাবি মন দুই মদ—যেখানে হোক যদিই পাস—
অমনি পানোন্মত্ত ওরে, সে মদ-স্রোতে ডুবে যাস!
যেমনি খাওয়া অমনি হবি আমার মত মুক্ত-প্রাণ,
ভেসে যাবে রাশ-ভারি তোর ঋষির মত দাড়ির রাশ!

[১৮৬]

মানব-স্বভাব জড়িয়ে বহে মন্দ ভালোর দুই ধারা,
শুভাশুভ দুঃখ ও সুখ দান নিয়তির—কয় যারা,
তাদের বলি—অপরাধী করছে খাম্‌কা কুগ্রহে,
তোমার চেয়ে হাজার গুণ যে অসহায় সে বেচারা!

[১৮৭]

তোমার নিন্দা করতে সাহস করবে না আর কেউ কোথাও!
এক সে উপায় আছে যদি বিশ্বে খুশী করতে চাও
এন্তার সব শ্রদ্ধা পাবে বড় ছোট সকলকার
মুস্‌লিম খৃষ্টান ইহুদী সবার যশো-গাথা গাও।

[১৮৮]

বলতে পার! টক সে কেন আঙুর যখন কাঁচা রয়?
পাকলে ভরে মিষ্টি রসে, তারই শরাব তিক্ত হয়।
কাঠকে কুঁদে কুঁদে যখন শিল্পী গড়ে রবাব বীণ
সেই কাঠে সেই শিল্পী বেণু গড়তে পারে? নয় গো নয়!

[১৮৯]

খ্যাতির মুকুট পরলে হেথায় নিন্দা-গ্লানির পাঁক হানে,
বলবে ষড়যন্ত্রকারী রো'স যদি গোরস্থানে।
'খিজির' হও আর 'ইলিয়াস' হও; সব-সে-আচ্ছা এই ধরায়
জানতে চাসনে কারেও আর তোরেও কেহ না জানে।

[১৯০]

খৈয়াম! তুই কাঁদিস কেন পাপের ভয়ে অযথা?
দুঃখ করে কেঁদে কি তোর ভরবে প্রাণের শূন্যতা?
জীবনে যে করল না পাপ নাই দাবী তার তাঁর দয়ায়
পাপীর তরেই দয়ার সৃষ্টি, আনন্দ কর ভোল ব্যথা!

[১৯১]

আবার যখন মিলবে হেথায় শরাব সাকীর আঞ্জামে,
হে বন্ধুদল, একটি ফোঁটা অশ্রু ফেলো মোর নামে!
চক্রাকারে পাত্র ঘুরে আসবে যখন, সাকীর পাশ,
পেয়ালা একটি উল্টে দিয়ো স্মরণ করে খৈয়ামে!



[১৯২]

বিশ্ব-দেখা জাম্‌শেদিয়া পেয়ালা খুঁজি জীবন-ভর
ফিরনু বৃথাই সাগর গিরি কান্তার বন আকাশ-ক্রোড়।
জানলাম শেষ জিজ্ঞাসিয়া দরবেশ এক মুর্শিদে—
জাম্‌শেদের সে জাম-বাটি এই আমার দেহ আত্মা মোর।

[১৯৩]

আকাশ যেদিন দীর্ণ হবে, আসবে যেদিন ভীম প্রলয়,
অন্ধকারে বিলীন হবে গ্রহ তারা জ্যোতির্ময়,
প্রভুর আমার দামন ধরে বলব কেঁদে, "হে নিঠুর,
নিরপরাধ মোদের কেন জন্মে আবার মরতে হয়?"

[১৯৪]

হৃদয় যদি জীবনে হয় জীবনের রহস্যজয়ী,
খোদা কি, তা জানতে পারে মৃত্যুতে সে অবশ্যই।
কিন্তু তুমি থেকেই যদি শূন্য ঠেকে সব কিছুই,
তুমি যখন রইবে না কাল জানবে কি আর শূন্য বই?

[১৯৫]

খৈয়াম! তোর দিন দুয়েকের এই যে দেহের শামিয়ানা—
আত্মা নামক শাহনশাহের হেথায় ক্ষণিক আস্তানা।
তাম্বুওয়ালা মৃত্যু আসে আত্মা যখন লন বিদায়,
উঠিয়ে তাঁবু অগ্রে চলে; কোথায় সে যায় অ-জানা।

[১৯৬]

পৌঁছে দিও হজরতেরে খৈয়ামের হাজার সালাম,
শ্রদ্ধাভরে জিজ্ঞাসিও তাঁরে লয়ে আমার নাম—
"বাদশানবী! কাঁজি খেতে নাই ত নিষেধ শরিয়তে,
কি দোষ করল আঙুর পানি? করলে কেন তায় হারাম?"

[১৯৭]

তত্ত্ব-গুরু খৈয়ামেরে পৌঁছে দিও মোর আশিস্
ওর মত লোক বুঝল কিনা উল্টো ক'রে মোর হদিস!
কোথায় আমি বলেছি, যে, সবার তরেই মদ হারাম?
জ্ঞানীর তরে অমৃত এ, বোকার তরে উহাই বিষ!

তামাম শোধ

কুঞ্চিকা

(৩) গুল—ফুল।
(৪) শীরীন—মিষ্ট; শীরাজী—২১ পশ্য।
(৬) ২২ পশ্য।
(৮) ফজুল—অতিরিক্ত; বাগে—বাগানে।
(১৭) গুলিস্তান—ফুলের বাগান।
(১৯) সুরত—সৌন্দর্য।
(২১) শীরাজী—ইরানের বিখ্যাত শীরাজ শহরের মদ্য বিশেষ; খোশবো—সুগন্ধ, খুশবাই।
(২২) নার্গিস, গুল বনোসা—ফুল বিঃ।
(২৮) মোল্লাজি—শাস্ত্রে পণ্ডিত যে ব্যক্তি মদ্যপানাদি মানা করেন।
(৩২) খাজা—গুরু, সম্মানিত ভদ্রলোক। আর্জী—নিবেদন।
(৩৫) লালা-রুখ্—ফুলের মত গাল বিশিষ্টা।
(৩৮) জামশেদ, বাহরাম—বিখ্যাত রাজা এবং শিকারী।
(৪৮) বদখ্শান্—চুণীর জন্য বিখ্যাত প্রদেশ।
(৪৯) ইহুদ-খানা—ইহুদিদের প্রার্থনাগার, সিনাগগ্।
(৫১) তিন তালাক—তিনবার তালাক দিলে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হয়।
নিকাহ্—বিবাহ।
(৫৩) হামজা—হজরৎ মুহম্মদের পিতৃব্য। মোস্তফা—হজরৎ মুহম্মদ (দঃ)।
(৫৪) রজব, শাবান, রমজান—মুসলমানের চান্দ্রমাস।
(৬১) তখ্ৎ—সিংহাসন।
(৬২) হুরী—স্বর্গকন্যা, অপ্সরী।
(৬৯) তওবা—আনুষ্ঠানিকভাবে কোন পাপ পুনরায় না করিবার শপথ গ্রহণ করিয়া আল্লার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করা।
নূহ্—পয়গম্বর বিশেষ; ইংরিজিতে 'নোওয়া'।
(৭০) গুল-বদনী—পুষ্প-তনু।
(৭৫) সরো—সাইপ্রেস গাছ।
(৭৯) শরিয়ৎ—ধর্মের বিধি-বিধান। খেলাফ্ করা—ভাঙা। গুল-লালা-রুখ—৩৫নং পশ্য।
(৮৩) খোশখবর—সুসংবাদ।
(৮৮) জিহুন—নদী বিঃ।
(৯১) মহ্মুদ—গজনীর রাজা। সুলতনৎ—রাজত্ব। নবী—পয়গম্বর, প্রফেট; ডেভিড্ (দাউদ)।
(৯৪) কায়কোবাদ, কায়কাউস — ইরানের প্রখ্যাত দুইজন রাজা। তুস—বিখ্যাত শহর।
(৯৫) শের—বাঘ। জামতুক—ভারতীয় রাজার নাম।
(৯৬) আরাস্তু—এরিস্টট্ল। রুম—ইটালি। কায়সর—সীজার। জামশেদিয়া—জামশেদ রাজার। বাহরাম—৩৮নং পশ্য।
(৯৮) খৈয়াম—তাম্বু নির্মাতা।
(৯৯) গলিস—নোংরা। নসীব—কপাল, অদৃষ্ট।
(১০০) খরাব—খারাপ।
(১০২) নূহের বন্যা—পয়গম্বর নূহের সময় একবার বিশ্বব্যাপী বন্যা হয়।
(১০৯) বলখ্—শহর বিঃ; সংস্কৃতে বল্হীক। নিশাপুর—শহর বিঃ; খৈয়ামের জন্মভূমি।
(১১২) কায়খসরু, ফরীদুন—ইরানের রাজা।
(১১৫) লালা-রুখদিল—৩৫নং ও ৭৯নং পশ্য।
(১২৪) মস্ত—অচৈতন্য, মাতাল।
(১২৯) জায়নামাজ—নামাজ পড়ার আসন।
(১৩০) আলী মুর্তজা—হজরৎ মুহম্মদের জামাতা। শীয়াদের প্রথম ইমাম।

(১০২) শেখ—ধর্মশাস্ত্রে পণ্ডিত।
(১০৪) মুফতি—যিনি ধর্মানুশাসন (ফতোয়া) প্রচার করেন।
(১০৫) কাফের—ধর্মে অবিশ্বাসী, চার্বাক-পন্থী।
(১০৮) ফতোয়া—ধার্মিক অনুশাসন, ফয়ত্তা।
(১০৯) রইস—সম্ভ্রান্তজন।
(১৪৭) লওহ, কলম—ভাগ্যের লিখন।
বেহেশত-দোজখ—স্বর্গ-নরক।
(১৫০) এলাজ—চিকিৎসা।
তাবুৎ—কফিন।
(১৫৫) তকদীর—ভাগ্য, কিস্মৎ।
রুস্তম, জাল—বড় বড় বীর।
হাতেমতাই—আরবের দাতাকর্ণ।
(১৫৬) ইয়াকুত—মণি বিঃ।
(১৫৮) ইয়াসিন, বরাত—কুরানের রহস্যার্থে। শবে বরাত—যে 'ভাগ্য রজনীতে' আগামী বৎসরের ভাগ্য লিপি লেখা হয়।

(১৬২) আসমানি হাত—ভাগ্য-লিখন।
(১৬৩) রুখ—ইংরিজিতে রুক্ বা কাস্‌ল, বাংলায় নৌকা, দাবা খেলায়। এখানে সুন্দরী ও ঘুঁটি উভয়ার্থে।
(১৬৪) 'পার্বিণ', বুরুজ—আকাশের গ্রহ নক্ষত্র-চন্দ্রের কক্ষ।
(১৬৫) জর্জিয়া—রুশিয়ার জর্জিয়া প্রদেশের সুন্দরীরা বিখ্যাত।
(১৬৭) বাবিল—ব্যাবিলন।
(১৭২) দিলরুবা—প্রিয়া।
(১৭৭) নিয়ামত—অনুগ্রহ, প্রসাদ।
(১৮৯) খিজির, ইলিয়াস—অমৃতবারির আবিষ্কর্তা একই ব্যক্তির ভিন্ন নাম; ইংরিজি Elias.
(১৯২) মুর্শিদ—গুরু। জাম্‌শেদিয়া—৯৬ পশ্য।
(১৯৩) দামন—অঞ্চল, কুর্তার অগ্রভাগ।
(১৯৫) শাহনশাহ — রাজার রাজা।
(১৯৭) হদিস্—প্রমাণ, বিধান।

